ধ্যানযোগ

(তত্ত্ব ও সাধন)

শ্রীহট্ট মুরারিচাঁদ কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক ও অস্থায়ী অধ্যক্ষ,
শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার সংস্কৃত টীকাকার ও ইংরেজী অনুবাদক,
তত্ত্বরত্ন-বিদ্যাভূষণোপাধিক

শ্রীশ্রীশচন্দ্র বেদান্তভূষণ, ভাগবতরত্ন, বি-এ

প্রণীত

যোঽন্তঃ প্রবিশ্য মম বাচমিমাং প্রসুপ্তাং
সঞ্জীবয়ত্যখিলশক্তিধরঃ স্বধাম্না।
অন্যাংশ্চ হস্তচরণশ্রবণত্বগাদীন্
প্রাণান্নমো ভগবতে পুরুষায় তুভ্যম্॥

—ভাগবত, ৪।৯।৬

কলিকাতা

খ্রীষ্টাব্দ ১৯৩৫

মূল্য—কাগজের কভার ৸৹, কাপড়ের বাঁধান ১৲

প্রাপ্তিস্থান

(১) লেখক, প্রতিভা কুটীর, ১২ পেয়ারাবাগান ষ্ট্রীট্,
বিডন ষ্ট্রীট্ পোঃ আঃ, কলিকাতা।

(২) চক্রবর্ত্তী, চাটার্জ্জি এণ্ড কোং,
১৫, কলেজ স্কুয়েয়ার্, কলিকাতা।

(৩) সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ অফিস্,
২১১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।

(৪) মহেশ লাইব্রেরী,
১৯৫।২, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।

কলিকাতা।
২৫নং রায়বাগান ষ্ট্রীট্, ইকনমিক প্রেসে
শ্রীশৈলেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, এম্, এস্, সি কর্ত্তৃক মুদ্রিত
এবং
১২ পেয়ারাবাগান ষ্ট্রীট্, প্রতিভা কুটীর হইতে
গ্রন্থকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

উৎসর্গ

যাঁহাদের পুণ্যস্মৃতি অক্ষয়কবচরূপে আমাকে প্রতিনিয়ত রক্ষা করিতেছে, যাঁহাদের অনিন্দ্য-সুন্দর চরিত্রের অলক্ষ্য প্রভাবে আজীবন আমার অন্তরে শুভ প্রেরণার সঞ্চার হইতেছে, যাঁহাদের অদৃশ্যসত্তা এবং প্রেম ও আশীর্ব্বাদ আমাকে অনুক্ষণ বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে, আমার সদ্বৃত্তি ও সদাকাঙ্ক্ষা সমূহের জন্য যাঁহাদের নিকট আমার ঋণ অপরিশোধ্য, আমার সামান্য সাধু সঙ্কল্প এবং প্রচেষ্টায়ও যাঁহাদের আনন্দ অপরিমেয়, আমার পরমপূজনীয় সেই স্বর্গগত ধর্ম্মপ্রাণ পিতৃদেব এবং পরমারাধ্যা পুণ্যশীলা স্বর্গগতা মাতৃদেবীর পূত-পবিত্র শ্রীশ্রীচরণকমলে এই অযোগ্য অভাজন সন্তানের এই ক্ষুদ্র গ্রন্থ ভক্তি-অর্ঘ্যরূপে অর্পিত হইল।

মুখবন্ধ।

ধ্যান বিষয়ে অনেকের পরিষ্কার ধারণা নাই। এমন লোকও বিরল নহেন যাঁহারা এই সম্বন্ধে ভ্রান্ত মত, এমন কি লঘুভাব ও পোষণ করিয়া থাকেন।

কেহ কেহ ইহাকে মনের একটা বিভ্রম বা খেয়াল (hallucination) ভিন্ন আর কিছুই নয়, মনে করেন। ধ্যানের সময় 'The mind goes a wool-gathering', মন নিষ্ফল চিন্তায় ঘুরিয়া বেড়ায়, এমন মন্তব্যও কখনও শুনা যায়। একবার জনৈক বিশিষ্ট ব্যক্তি তাঁহার মামা সম্পর্কের একজনকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "মামা, তুমি আহ্নিকের পর চুপ ক'রে বসে কার সর্ব্বনাশ ধ্যান কর ?" ভক্তিভাজন পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় বিলাত হইতে ফিরিয়া আসিয়া গল্প করিয়াছিলেন, "একদিন বিখ্যাত (অমুক) সাহেব আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'শাস্ত্রী, তোমরা যে ধর্ম্মসাধনে ধ্যানকে এত উচ্চ স্থান দেও, ধ্যান ব্যাপারটা কি, আমায় বুঝাইয়া দিতে পার ? আমি ত খুব নিষ্ঠার সহিত তাঁহাকে ধ্যানের কথা বলিতে আরম্ভ করিলাম। যখন আমি নিবিষ্টমনে বলাতে নিযুক্ত ছিলাম, তখন হঠাৎ তাঁর মুখের দিকে আমার দৃষ্টি পড়িল, আমি দেখিলাম তিনি মুচকিয়া মুচকিয়া হাসিতে-ছেন, বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, 'আপনি হাস্‌ছেন যে ?'

সাহেব উত্তর করিলেন, 'শাস্ত্রী, তুমি যদি কিছু মনে না কর, তাহলে বলতে পারি।' আমি বলিলাম, 'না আপনি বলুন', তখন সাহেব বলিলেন, 'শাস্ত্রী, তোমার ব্যাখ্যা শুনতে শুনতে আমি ভাবছিলুম তোমাদের সমগ্র জাতিটা (whole nation) যখন ধ্যানে মগ্ন ছিল, আমরা তখন ছো মেরে তোমাদের দেশটা কেড়ে নিয়েছি।" এমন ব্যক্তির মুখেও ধ্যান সম্বন্ধে এরূপ পরিহাস!

উপাসনার (পূজা-অর্চ্চনাদির) শ্রেষ্ঠ অঙ্গ যে ধ্যান, যাহাতে সাধনের পূর্ণতা, সেই ধ্যান সম্বন্ধে ভ্রান্ত বা লঘু ধারণা সর্ব্বথা অবাঞ্ছনীয়। ধ্যান সাক্ষাৎ ব্রহ্মদর্শনের, ব্রহ্মসংস্পর্শের, ব্রহ্মযোগের পথ। ধ্যানের অভাবে কত সাধক অপরোক্ষ ব্রহ্মানুভূতি হইতে বঞ্চিত হইয়া অনুমান, কল্পনা ও অন্ধ-বিশ্বাসের রাজ্যে বিচরণ করেন। ধ্যানবিমুখতা মহা অকল্যাণের কারণ। কত সময় মনে হইয়াছে, ইহার কি কোন প্রতীকার নাই? কিন্তু দীর্ঘকাল মধ্যেও কোন বিশেষ উপায়ের কথা মনে আসে নাই।

প্রায় ৬ বৎসর পূর্ব্বে পিঠাপুরের মহারাজার অনুরোধে আচার্য্য পণ্ডিত সীতানাথ তত্ত্বভূষণ মহাশয় শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার একটী বিশেষ সংস্করণ বাহির করিবার কার্য্যভার গ্রহণ করেন, এবং আমি উহার উত্তরার্দ্ধের টীকা ও অনুবাদ করিয়া তাঁহার শ্রম লাঘব করি। যখন এই কার্য্যে নিযুক্ত ছিলাম, তখন উক্ত গ্রন্থের ত্রয়োদশ অধ্যায়ের ২৪শ শ্লোকের টীকা করিবার সময় আমার

রোগশয্যায় ধ্যানের বিষয়টী আমার চিত্তকে অধিকার করে। সেই সময়ে ভগবৎকৃপায় আমার এমন একটী অভিজ্ঞতা হয়, যাহার ফলে ধ্যান বিষয়ে ধর্ম্মার্থিগণের মনোযোগ আকর্ষণ করার সঙ্কল্প আমার অন্তরে উদিত হয়। ইহার প্রায় ৪ বৎসর পরে 'সঙ্গত-সভা'র বার্ষিক অধিবেশনে ধ্যান বিষয়ে কিছু বলিবার ভার আমার উপর অর্পিত হয়। আমি তখন আমার বক্তব্য লিপিবদ্ধ করিয়া পাঠ করি। এখন সেই পঠিত প্রবন্ধকে পরিবর্দ্ধিত করিয়া এই ক্ষুদ্র গ্রন্থের আকারে সর্ব্বসমক্ষে উপস্থিত করিতেছি।

ধ্যান যোগের,—ব্রহ্ম ও জীব উভয়ের সহিত প্রেম-যোগের —প্রকৃত প্রকৃষ্ট পথ। ধ্যানের গতি প্রেমের উৎসের দিকে, প্রেমের সঙ্গম-তীর্থের অভিমুখে—যেখানে আত্মার প্রেমমন্ত্রে প্রকৃত দীক্ষা, যেখানে প্রেমের গাঢ়, নিবিড়, মধুর, বিশ্বপ্রসারী আলিঙ্গন। ধ্যান প্রেমের যোগসূত্র, ইহাতে কাহারও সহিত বিচ্ছেদ নাই। ধ্যানী এবং প্রেমিক এক পর্য্যায়ভুক্ত।

যদি এই ক্ষুদ্র গ্রন্থ একটী পিপাসু আত্মার ও প্রেম-যোগ সাধনের সহায় হয়, আমি নিজেকে কৃতার্থ মনে করিব।

এই গ্রন্থ প্রণয়নে অনেক ভক্তিভাজন এবং শ্রদ্ধেয় ও প্রেমাস্পদ বন্ধু আমাকে সাহায্য করিয়াছেন, তাঁহাদের নিকট আমার অন্তরের কৃতজ্ঞতা অর্পণ করিতেছি।

৫ই মাঘ, ১৩৪১। গ্রন্থলেখক।

সূচী

মঙ্গলাচরণ

ওঁ ব্রহ্মার্পণমস্তু

ওঁ সচ্চিদানন্দ-ব্রহ্ম

সর্ব্বেষাং জীবনালোকং সর্ব্ববুদ্ধি-প্রসাধনম্।
সিদ্ধি-সংশুদ্ধি-দাতারং শ্রীশ ত্বাং প্রণমাম্যহম্॥

হে সর্ব্বসম্পদের অধিপতি পরমেশ্বর, তুমি সকলের জীবনের আলোক, সকলের বুদ্ধির বিভূষক এবং সিদ্ধি ও পবিত্রতা দাতা, তোমাকে প্রণাম করি।

"আবিরাবীর্ম্ম এধি।"—হে স্বপ্রকাশ, তুমি আমার নিকট প্রকাশিত হও। যে গুরুকার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেছি, সেই কার্য্যে তুমি আমার সহায় হও। আমার পথ তুমি আলোকিত কর। আমার বুদ্ধি ও বিবেককে তুমি নির্ম্মল কর। আমার দৃষ্টিকে তুমি উজ্জ্বল কর। আমাকে তোমা হইতে বিচ্যুত হইতে দিও না। করুণাময় পিতা, এই অকিঞ্চনকে তুমি দয়া করিয়া যেটুকু জ্ঞান এবং যৎসামান্য যেটুকু অনুভূতি ও অভিজ্ঞতা দিয়াছ, তাহার সদ্ব্যবহার করিবার শক্তি আমাকে দেও। এই কার্য্যে আমার যদি কিছু ভ্রমপ্রমাদ হয়, তাহা যেন সর্ব্বথা উপেক্ষিত ও পরিত্যক্ত হয়। আমার অজ্ঞতা ও মলিনতা-

জনিত অপরাধ দ্বারা তোমার গৌরব যেন কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ না হয়। ইহাতে যাহা সত্য আছে, যাহা তোমার, তাহা যেন সর্ব্বতো-ভাবে গৃহীত ও জয়যুক্ত হয়, এবং তাহাদ্বারা সকলের মতিগতি যেন তোমার দিকে ধাবিত ও তাঁহাদের দৃষ্টি যেন তোমাতে নিবদ্ধ হয়। যে প্রেরণা এই ক্ষুদ্র গ্রন্থ মুদ্রণে আমাকে ব্রতী করিয়াছে তাহা যেন ফলবতী হয়, তোমার নিকটে এই আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করি। তোমার মঙ্গল ইচ্ছা পূর্ণ হউক

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ হরিঃ ওঁ।

অবতরণিকা

১

তৈত্তিরীয় উপনিষদের ব্রহ্মানন্দবল্লী-নাম-দ্বিতীয়বল্লীর সপ্তম অনুবাকে ঋষি বলিতেছেন—

"রসো বৈ সঃ। রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বানন্দী ভবতি। কো হ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাদ্ যদেষ আকাশ আনন্দো নস্যাৎ। এষ হ্যেবানন্দয়তি। যদাহ্যেবৈষ এতস্মিন্নদৃশ্যেঽনাত্ম্যেঽনিরুক্তেঽ-নিলয়নেঽভয়ং প্রতিষ্ঠাং বিন্দতে অথ সোঽভয়ং গতো ভবতি। যদা হ্যেবৈষ এতস্মিন্নুদরমন্তরং কুরুতে অথ তস্য ভয়ং ভবতি।"

—"তিনি রসস্বরূপ। এই জীব রসস্বরূপকে প্রাপ্ত হইয়াই সুখী হয়। যদি (হৃদয়) আকাশে এই আনন্দস্বরূপ না থাকিতেন, তবে কে বা আপানচেষ্টা (প্রশ্বাসকার্য্য) করিত, কেই বা প্রাণন (নিশ্বাসকার্য্য) করিত? ইনিই জীবকে আনন্দ দান করেন। যখন এই সাধক এই অদৃশ্য, অশরীরী, অনির্ব্বচনীয়, নিরাধার ব্রহ্মে নির্ভয়ে প্রতিষ্ঠা-লাভ করেন, তখন তিনি অভয় প্রাপ্ত হন। যখন তিনি ইহাতে অল্পমাত্রও ভেদ দর্শন করেন (অর্থাৎ ব্রহ্ম ব্যতীত অন্য বস্তুর অস্তিত্ব কল্পনা করেন), তখন তাঁহার ভয় হয়।"

এই আনন্দস্বরূপ ব্রহ্মের সাক্ষাৎ দর্শন এবং তাঁহাতে প্রতিষ্ঠা লাভ ও অভয় প্রাপ্তি, ইহাই মানবজীবনের চরম লক্ষ্য ও পরম পুরুষার্থ। ইহাই পরিপূর্ণ আনন্দ সম্ভোগের অবস্থা। "এষ ব্রহ্মলোকঃ।" (বৃহ ৪।৪।২৩)—ইহাই ব্রহ্মলোক। জীবনের এই লক্ষ্যসিদ্ধি সাধন-সাপেক্ষ। সেই সাধনের সর্ব্বোচ্চ স্তর ধ্যান।

ব্রহ্মসাধনে ধ্যানের স্থান

২

বৃক্ষের চরম বিকাশ যেমন পুষ্পে ও ফলে, ধর্ম্মসাধনের পরিণতি তেমনই ধ্যানে ও যোগে। জ্ঞানের অনুশীলনে প্রকৃত ধর্ম্মসাধনের সূচনা। জ্ঞান যুক্তি ও বিচারের সাহায্যে সাধ্য-বস্তু নির্ণয় করে, কর্ম্ম জ্ঞানকে পরিপুষ্ট ও পরিস্ফুট করে, এবং ভক্তি সাধ্যবস্তুর সহিত আমাদের সম্বন্ধকে মধুর করে। এই তিনের অনুশীলনে মানব ব্রহ্মানন্দ সম্ভোগ করিয়া কৃতকৃতার্থ হয়। সর্ব্বোচ্চ-দর্শনসম্মত তত্ত্ববিদ্যা এবং সাধকের অনুভূতি এই সাধ্যবস্তুকে ব্রহ্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করে। যিনি বৃহৎ, 'নিরতিশয়-মহত্ত্ব-লক্ষণ-বৃদ্ধিমান্', যাঁহার সমান অথবা যাঁহা অপেক্ষা বড় আর কেহ নাই, কিছু নাই, এবং যিনি অন্য সকলকে বড় করেন, তিনিই ব্রহ্ম। ধর্ম্মসাধনে কেবলমাত্র ব্রহ্ম-জ্ঞান ও ব্রহ্ম-পরিচয়ই যথেষ্ট নহে। শুধু ব্রহ্মকে জ্ঞানায়ত্ত করা বা ভূমাবিৎ হওয়াই সাধনের শেষ কথা নহে। সাধনের

লক্ষ্য অপরোক্ষ ব্রহ্মানুভূতি বা সাক্ষাৎ ব্রহ্মদর্শন এবং পুরুষ বা ব্যক্তিরূপী ব্রহ্মের সহিত অব্যবহিত জীবন্ত যোগসংস্থাপন।

ধ্যানের আবশ্যকতা

এই যোগের সুরসাল ফল ভক্তি। এই যে মধুর ব্রহ্মযোগ, ইহার প্রতিষ্ঠা ধ্যান-সাপেক্ষ। ব্রহ্মের সহিত যোগসংস্থাপন, ব্রহ্মের সাহচর্য্য লাভ, ব্রহ্মের সহিত বাক্যালাপ বা ভাবের ও চিন্তার বিনিময় এবং তজ্জনিত অনির্ব্বচনীয় আনন্দসম্ভোগ, এই সমুদয় ব্যতীত ব্রহ্মসাধকের আত্মার আর কিছুতেই তৃপ্তি নাই। এইজন্যই ব্রহ্মার্থী ব্যাকুল আত্মা ব্রহ্মানন্দ সম্ভোগের জন্য চিরদিন ধ্যানকে আশ্রয় করিয়াছেন।

৩

সাধনের ক্রম

অগ্রে ব্রহ্মজ্ঞান, তৎপর ব্রহ্মধ্যান ও পরিশেষে ব্রহ্মানন্দ-রস পান, ব্রহ্মসাধনের ইহাই ক্রম।* এই ক্রম শাস্ত্র ও যুক্তি উভয় সম্মত।

শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের নিম্নোদ্ধৃত কয়েকটী বাক্যে এই ক্রম সুস্পষ্ট লক্ষিত :—

(১) “তৎকারণং সাংখ্যযোগাধিগম্যং।” (৬।১৩)

---

* শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘যোগী জাগে, ভোগী রোগী কোথায় জাগে ?’ ইত্যাদি সঙ্গীতের দ্বিতীয় ছত্রে ‘ব্রহ্মজ্ঞান, ব্রহ্মধ্যান, ব্রহ্মানন্দ রসপান’ এই তিনটী শব্দ এইরূপ পরপর ব্যবহৃত হইয়াছে।

—"সেই কারণরূপী ব্রহ্ম সাংখ্য (বস্তুতত্ত্ববিচার অর্থাৎ জ্ঞান) এবং যোগ (চিত্তসমাধানরূপ সাধন) দ্বারা প্রাপ্য।"

(২) "হৃদা মনীষা মনসাভিকॢপ্তঃ।" (৪।১৭)

—"হৃদয়, সংশয়রহিত বুদ্ধি ও সম্যক্ দর্শনরূপ মনন দ্বারা তিনি (এই বিশ্বকর্ম্মা মহাত্মা ব্যাপক এবং অশরীর পুরুষ) প্রকাশিত হন।" অবিকল এই কথাই কঠোপনিষদের ৬।৯ শ্রুতিতেও আছে।

(৩) "হৃদা হৃদিস্থং মনসা য এন-
মেবং বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি।" (৪।২০)

—"যাঁহারা হৃদয় ও মনন দ্বারা ইঁহাকে (মঙ্গলস্বরূপ ব্রহ্মকে) হৃদয়স্থিত বলিয়া জানেন, তাঁহারা অমর হন।"

(৪) "তস্যাভিধ্যানাদ্ যোজনাৎ তত্ত্বভাবাদ্
ভূয়শ্চান্তে বিশ্বমায়ানিবৃত্তিঃ।" (১।১০)

—"তাঁহার (সেই অদ্বিতীয় দেবতার) অভিধ্যান অর্থাৎ চিন্তন এবং তাঁহার সহিত সংযোগ ও একত্ব ("যস্ত্বমসি সোঽহমস্মি"—কৌষীতকি ১—এই অনুভূতি) দ্বারা অন্তে সম্পূর্ণরূপে সমুদয় মোহ নষ্ট হয়।"

এই কতিপয় উদ্ধৃত বাক্যে প্রথমে জ্ঞান, তৎপরে মনন, চিন্তন বা ধ্যান (এই তিনটী এক পর্য্যায়ের শব্দ) এবং ধ্যানে ব্রহ্মের সহিত যোগ ও ব্রহ্মৈকত্ব অর্থাৎ ব্রহ্মের সহিত সাধকের

একত্ববোধ এবং তন্নিবন্ধন মোহের বিনাশ ও অমৃতত্ব প্রাপ্তি-জনিত পরিপূর্ণ আনন্দ সম্ভোগ, সাধনের এইরূপ ক্রম বা পৌর্ব্বাপর্য্য পরিস্ফুট হইয়াছে।

৪

সূর্য্যের সহিত যোগ ভিন্ন যেমন চন্দ্র নিষ্প্রভ, মৃত্তিকার সহিত যোগ ভিন্ন যেমন বৃক্ষলতাদি নির্জীব, তৈলাধারের সহিত যোগ ভিন্ন যেমন দীপ নির্ব্বাপিত, সূত্রধারীর সহিত যোগ ভিন্ন যেমন উড্ডীয়মান 'ঘুড়ী' বিভ্রান্ত ও নিপতিত, তেমনই ব্রহ্মের সহিত সাক্ষাৎ যোগ ভিন্ন মানবাত্মা নির্বীর্য্য, লক্ষ্যহীন ও তমসাচ্ছন্ন। ধ্যান এই ব্রহ্মযোগের সংযোজক সূত্র। জীবনকে সুন্দর, সরস, সজীব ও বিকশিত করিতে হইলে অন্তরের নিভৃতে ব্রহ্মের 'প্রকাশ'-মন্দিরে প্রবেশ করিয়া ধ্যাননিমগ্ন হইয়া জীবনের উৎস ও বিধাতা যিনি সেই পরমপুরুষ ব্রহ্মের সহিত সাক্ষাৎ যোগযুক্ত হইতে হইবে। এই যোগের ভূমিতে প্রেম ও পুণ্যের অধিষ্ঠান। সাধক যখন এই ভূমিতে উপনীত হন, তখন তিনি ব্রহ্মালঙ্কারে ভূষিত হন, ক্রমে তাঁহার মধ্যে ব্রহ্মগন্ধ, ব্রহ্মরস, ব্রহ্মতেজ ও ব্রহ্মযশ প্রবেশ করে, ব্রহ্মের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎকার ও বাক্যালাপ হয়, এবং ব্রহ্ম হইতে তিনি যে অভিন্ন, "যস্ত্বমসি সোঽহমস্মি" (তুমি যে আমিও সে), ব্রহ্মকে তিনি এই কথা বলিতে সমর্থ

ধ্যান অপরিহার্য্য

হন।* জীবন মাত্রেরই বিকাশ বা বিবর্ত্তনের ধারা এইরূপ,—ইহার আরম্ভ অন্তরে, বহির্বিকাশ যাহা দৃষ্ট হয় তাহা অন্তর্বিকাশেরই অভিব্যক্তি মাত্র। মানবাত্মার বিকাশের সূচনাও এইরূপই লোকচক্ষুর অগোচরে নিভৃত অন্তর-মন্দিরে। সেখানে ব্রহ্মের সহিত ধ্যানযোগে যুক্ত ব্রহ্মীভূত জীবনই ঐকতানিক জীবন (life of harmony)। ইহাই সত্য-জীবন, ইহার অন্তরে বাহিরে সর্ব্বত্র ব্রহ্মের স্ফুরণ, ইহা ব্রহ্মময়, সরস, সতেজ ও চিরযৌবনের অম্লান সৌন্দর্য্যে শোভিত।

ব্রহ্মদর্শন ও তত্ত্বদর্শনে ধ্যান যে কিরূপ প্রয়োজনীয় সহায় তৎসম্বন্ধে শ্বেতাশ্বতর ঋষির দুইটী বাক্য উদ্ধৃত করিতেছি। একটীতে ব্রহ্মদর্শন বিষয়ে ঋষি বলিতেছেন—

* "স ব্রহ্মালঙ্কারেণালঙ্কৃতঃ।.........তং ব্রহ্মগন্ধঃ প্রবিশতি। ....তং ব্রহ্মরসঃ প্রবিশতি।.........তং ব্রহ্মতেজঃ প্রবিশতি। ....তং ব্রহ্মযশঃ প্রবিশতি। ....যস্ত্বমসি সোঽহমস্মি।" (কৌষী ১)। ঋগ্বেদভাষ্যে গায়ত্রী মন্ত্রের ব্যাখ্যায় আচার্য্য সায়ণ ব্রহ্মের ভর্গ অর্থাৎ তেজ বা জ্ঞান ও শক্তির ধ্যান কিরূপে কর্ত্তব্য ইহা বলিতে যাইয়া কৌষীতকির "যস্ত্বমসি সোঽহমস্মি" এই কথাই কিঞ্চিৎ অন্য আকারে (প্রথম পুরুষে) ব্যক্ত করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, "তং যোঽহং সোঽসৌ যদ্বা যোঽসৌ সোঽহম্ ইতি বয়ং ধ্যায়েম" অর্থাৎ 'আমিও যে তিনিও সেই অথবা তিনিও যে আমিও সেই' এই ভাবে আমরা তাহা ধ্যান করি।

"স্বদেহমরণিং কৃত্বা প্রণবঞ্চোত্তরারণিম্।
ধ্যাননির্মথনাভ্যাসাদ্ দেবং পশ্যেন্নিগূঢ়বৎ ॥"

(শ্বেত ১।১৪)

—"নিজ দেহকে অরণি অর্থাৎ ঘর্ষণদ্বারা অগ্নি জ্বালনার্থ যে কাষ্ঠ, সেইরূপ করিয়া, এবং প্রণব অর্থাৎ ওঁকারকে উত্তরারণি অর্থাৎ ঊর্দ্ধারণি করিয়া, ধ্যানরূপ ঘর্ষণ অভ্যাসদ্বারা সাধক ঈশ্বরকে নিগূঢ় অগ্নিবৎ দর্শন করিবেন।"

অপরটীতে, মানুষের বুদ্ধি ও জ্ঞান তত্ত্বদর্শনে যখন পরাস্ত তখন ধ্যানই যে তাহার পরম সহায় এই কথাটী ঋষি আমাদের জন্ম, জীবনধারণ ও সুখদুঃখের ব্যবস্থার কারণ কি ব্রহ্ম, না কাল, নিয়তি প্রভৃতি, এই প্রশ্নের উত্তররূপে বলিতেছেন—

"তে ধ্যানযোগানুগতা অপশ্যন্
দেবাত্মশক্তিং স্বগুণৈর্নিগূঢ়াম্।" (শ্বেত ১।১৩)

—"ধ্যানযোগপরায়ণ" (হইয়া) "ঋষিগণ স্বগুণসমূহ দ্বারা অর্থাৎ সত্ত্বরজস্তমোগুণ দ্বারা বা কার্য্যভূত বিষয় সমূহ দ্বারা প্রচ্ছন্ন দেবাত্ম-শক্তি অর্থাৎ পরমেশ্বরের নিজ শক্তি দর্শন করিয়াছেন।"

এতদ্দ্বারা ধ্যান যে ধর্ম্মসাধনে কিরূপ অপরিহার্য্য ইহা সহজেই বোদ্ধব্য।

৫

আমাদের দেশে ধ্যানের ইতিহাস অতি প্রাচীন। বৈদিক যুগে অন্যতম মন্ত্রদ্রষ্টা, ক্ষত্রিয়কুলতিলক রাজর্ষি বিশ্বামিত্র যে গায়ত্রী মন্ত্রের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছিলেন, যে মন্ত্র বেদমাতা নামে ও সর্ব্ব বেদের সার বলিয়া সর্ব্বত্র বিশ্রুত এবং যাহা প্রত্যেক ত্রৈবর্ণিক ব্যক্তির আহ্নিকের অন্তর্ভুক্ত হইয়া ব্রহ্মোপাসনাকে এ দেশে একেবারে বিলুপ্ত হইতে দেয় নাই, সেই গায়ত্রীমন্ত্র ব্রহ্মধ্যানের একটি অপূর্ব্ব সংক্ষিপ্ত মহামন্ত্র। ইহাতে ধ্যানের সুস্পষ্ট উল্লেখ আছে। মন্ত্রটী এই—

ধ্যানের প্রাচীনত্ব

"ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ তৎ সবিতুর্বরেণ্যং ভর্গোদেবস্য ধীমহি
ধিয়ো য়োনঃ প্রচোদয়াৎ ওঁ

* এই গায়ত্রী ঋকের প্রথম পাদের (ছন্দোদোষনিবারণার্থ) অক্ষর সংখ্যা পূরণের জন্য, অর্থাৎ ইহাতে যে একটী অক্ষরের অভাব আছে তাহা পূরণের জন্য, 'বরেণ্যং' শব্দটী 'বরেণিয়ং' এইরূপে উচ্চার্য্য। এই মন্ত্রটী ঋক্, যজুঃ ও সাম এই তিন বেদেই দৃষ্ট হয় এবং ভাষ্যকারগণ ইহার ভিন্ন ভিন্ন অর্থ করিয়াছেন। ইহার দুইটী বিশেষ স্বতন্ত্র ব্যাখ্যা, তাহার একটী সূর্য্যপক্ষে, অপরটী ব্রহ্মপক্ষে। একটীতে 'সবিতৃ' অর্থ 'সূর্য্য', অপরটীতে ইহার অর্থ 'জগৎ প্রসবিতৃ' অর্থাৎ ব্রহ্ম। সায়ণ এই ঋকের অর্থ উভয় পক্ষেই করিয়াছেন। শঙ্করের ব্যাখ্যা ব্রহ্মপক্ষে। বর্ত্তমান সময়ে এই ব্যাখ্যাই প্রধানতঃ গৃহীত হইয়াছে। আমরাও

—(ভূরাদি) সর্ব্বলোকপ্রকাশক সর্ব্বব্যাপী সেই জগৎ-প্রসবিতা দেবতার বরণীয় তেজ (জ্ঞান ও শক্তি) আমরা ধ্যান করি, যিনি আমাদিগকে বুদ্ধিবৃত্তি সকল প্রেরণ করিতেছেন (অথবা যিনি আমাদের বুদ্ধিবৃত্তি সকলকে প্রেরণ করিতেছেন অর্থাৎ স্ব স্ব কার্য্যে নিয়োজিত করিতেছেন)।

এই ব্যাখ্যাই গ্রহণ করিয়াছি। গায়ত্রীর ব্যাখ্যা এবং বিভিন্ন বঙ্গানুবাদের বিস্তৃততর বিবরণ স্বর্গীয় পণ্ডিত মহেশচন্দ্র বেদান্তরত্ন, বি, টি, কর্ত্তৃক ব্যাখ্যাত ও শ্রীযুক্ত পণ্ডিত সীতানাথ তত্ত্বভূষণ সম্পাদিত বৃহদারণ্যক উপনিষদের ৩৯৪—৭ এবং ৩৯৯—৬০০পৃঃ দ্রষ্টব্য।

রাজা রামমোহন রায় "গায়ত্রীর অর্থ" নামক নিবন্ধে গায়ত্রীর এইরূপ অর্থ করিয়াছেন :—

"সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের কারণ যে পরমাত্মা তেঁহ ভূর্লোকাদি বিশ্বময় হয়েন। সূর্য্যদেবের অন্তর্যামি সেই প্রার্থনীয় সর্ব্বব্যাপি পরমাত্মাকে আমাদের অন্তর্যামিরূপে আমরা চিন্তা করি, যে পরমাত্মা আমাদের বুদ্ধির বৃত্তি সকলকে প্রেরণ করিতেছেন।" অন্যত্র "গায়ত্র্যা ব্রহ্মোপাসনাবিধানং" নামক নিবন্ধের একস্থানে তিনি লিখিয়াছেন—

"মহানির্ব্বাণপ্রদায়িতন্ত্রে কহিতেছেন—যাঁহা হইতে স্থিতি, লয় ও সৃষ্টি হয়,যিনি ভুবনত্রয় ব্যাপিয়া রহেন, সূর্য্যদেবের সেই অন্তর্যামি অতি প্রার্থনীয় অনির্বচনীয় জোতীরূপ অব্যয় সর্ব্বান্তর্যামি বিভুকে আমরা চিন্তা করি, যিনি আমাদের বুদ্ধিস্থ হইয়া আমাদের বুদ্ধি সকলকে প্রেরণ করিতেছেন"।

বৃহদারণ্যক, ছান্দোগ্য, শ্বেতাশ্বতর, কৌষীতকি ও মৈত্রী প্রভৃতি উপনিষদ্, ভগবদ্গীতা, পাতঞ্জলদর্শন এবং অগ্নি, বিষ্ণু ও গরুড়াদি পুরাণে ধ্যান সম্বন্ধে বহু মহামূল্য তত্ত্ব লিপিবদ্ধ আছে। এ সকল গ্রন্থ হইতে এই পুস্তিকার স্থানে স্থানে অনেক শ্লোক উদ্ধৃত এবং তাহার অর্থ ও ব্যাখ্যা প্রদত্ত হইয়াছে।

৬

এই নবযুগের সাধনেও ধ্যানের বিশেষ অনুশীলন এবং ধ্যানতত্ত্বের বহু তথ্য উদ্‌ঘাটিত ও আলোচিত হইয়াছে। তাহারও সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। রাজর্ষি রামমোহন, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র, উপাধ্যায় গৌরগোবিন্দ প্রভৃতি ধ্যানযোগিগণের অভিমত ও অভিজ্ঞতার সারমর্ম্ম যথাস্থানে লিপিবদ্ধ করিয়াছি।

নবযুগে ধ্যান

*

উক্ত নিবন্ধের অন্য এক স্থানে তিনি গায়ত্রীর এইরূপ সংক্ষেপ অর্থ করিয়াছেন—

"সর্ব্বেষাং কারণং সর্ব্বত্র ব্যাপিনং আসূর্য্যাদস্মদাদিসর্ব্বশরীরিণামন্তর্যামিণং চিন্তয়ামঃ ইতি"—"সকলের কারণ সর্ব্বত্রব্যাপি সূর্য্য অবধি করিয়া আমাদের সকল দেহবন্তের অন্তর্যামি তাঁহাকে চিন্তা করি ইতি।"

৭

সাধারণতঃ আহ্নিকের সময়েই ধ্যান করা হইয়া থাকে। কিন্তু যাঁহারা ধ্যানে অভ্যস্ত তাঁহারা জানেন সর্ব্বসময়ে এবং সর্ব্বাবস্থায়ই ধ্যান করা যাইতে পারে। ধ্যানকে এইরূপে আয়ত্ত করিতে পারিলেই অধিকতর কল্যাণ প্রসূত হয়। সমঞ্জসীভূত ঐকতানিক জীবন লাভে ইহা পরম সহায়।

ধ্যান সর্ব্বদা করণীয়

ধ্যানের নিয়তকরণীয়ত্ব সম্বন্ধে অগ্নিপুরাণের উক্তি এই—

"গচ্ছংস্তিষ্ঠন্ স্বপন্ জাগ্রদুন্মিষন্ নিমিষন্নপি।
শুচির্বাপ্যশুচির্বাপি ধ্যায়েৎ সততমীশ্বরম্।" (৩৭৪।১২)

—চলিতে চলিতে, অবস্থিতি করিতে করিতে, নিদ্রা যাইতে যাইতে, জাগরণে চক্ষুর উন্মেষণ ও নিমেষণ করিতে করিতে, শুচি বা অশুচিই হউক সতত ঈশ্বরকে ধ্যান করিবে।

ধ্যানের ফল হাতে হাতে, ধ্যাননিরত ব্যক্তিমাত্রেই, এমন কি যিনি জীবনে একবারও ধ্যানের আস্বাদ পাইয়াছেন তিনিই, ইহার সাক্ষ্য প্রদান করিবেন। ধ্যানের আনন্দ সদ্যঃ ও অনির্ব্বচনীয়। এমন বিষয়ে যাহারা জানিয়া শুনিয়াও উদাসীন তাহাদের সম্বন্ধে পঞ্চদশীতে এইরূপ তীব্র মন্তব্য লিপিবদ্ধ হইয়াছে—

ধ্যান না করা প্রত্যবায়

"অনাত্মবুদ্ধিশৈথিল্যং ফলং ধ্যানাদ্ দিনে দিনে।
পশ্যন্নপি নচেৎ ধ্যায়েৎ কোঽপরোঽস্মাৎ পশুর্বদ ॥"

(নবম অধ্যায়, ধ্যানদীপপ্রকরণ, ১৫৬)

—আত্মাতে যাহাদিগের অনাত্মজ্ঞান আছে, অর্থাৎ যাহারা আত্মতত্ত্ব জানিতে পারে না, নিরন্তর ধ্যান করিতে করিতে ক্রমশঃ তাহাদের সেই অজ্ঞান বিনষ্ট হয়, ইহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ। যাহারা এইরূপ প্রত্যক্ষসিদ্ধ ফল দেখিয়াও ধ্যান করে না, তাহাদের অপেক্ষা পশু আর কে আছে বল ?

৯

ধ্যানের ফল সম্বন্ধে পঞ্চদশীর উক্তপ্রকরণের উক্তি এই—

"দেহাভিমানং বিধ্বস্য ধ্যানাদাত্মানমদ্বয়ম্।
পশ্যন্ মর্ত্ত্যোঽমৃতো ভূত্বা হ্যত্র ব্রহ্ম সমশ্নুতে ॥" (১৫৭)

ধ্যানের ধ্রুব ফল

—যাঁহারা দেহেতে আত্মাভিমান পরিত্যাগ করিয়া ধ্যানযোগ দ্বারা অদ্বয়ানন্দস্বরূপ পরমাত্মাকে প্রত্যক্ষ করিতে পারেন, তাঁহারা ইহকালেই অমৃত হইয়া ব্রহ্মানন্দ উপভোগ করিতে সমর্থ হয়েন।

ধ্যানযোগ

(তত্ত্ব ও সাধন)

—:*:—

১

ধ্যানের অর্থ

ধ্যান শব্দ প্রধানতঃ তিনটী অর্থে ব্যবহৃত হয়।

ইহার **প্রথম ও সাধারণ অর্থ** চিন্তা বা চিন্তন।

কৌষীতকি উপনিষদের তৃতীয় অধ্যায়ে "মনঃ সর্ব্বৈর্ধ্যানৈঃ সহাপ্যেতি"* প্রভৃতি একাধিক স্থলে ধ্যান শব্দের প্রয়োগ এই অর্থে।

ইহার **দ্বিতীয় অর্থ**—একবিষয়ক অর্থাৎ কোন এক বিষয়ে জ্ঞানধারা।

সুপ্রসিদ্ধ কোষকার হেমচন্দ্র ইহার এইরূপ অর্থ করিয়াছেন—"ধারণা-বিষয়ে একপ্রত্যয়সন্ততিঃ" (২।২৩৪), অর্থাৎ ধারণার বিষয়ীভূত বস্তুতে চিত্তবৃত্তির একতান প্রবাহ।

* [যখন এই পুরুষ (জীব) নিদ্রিত হয় এবং কোন স্বপ্ন দেখে না, তখন] **মন সমুদয় চিন্তার সহিত তাহাতে** (প্রাণোপাধিক জীবে) **গমন করে**।

গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ে "ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ সঙ্গস্তেষূপজায়তে"* ইত্যাদি (৬২) শ্লোকে 'ধ্যায়তঃ' কথাটী এই অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।

বেদান্তসারে ধ্যানের সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে—"অদ্বিতীয়বস্তুনি বিচ্ছিদ্য বিচ্ছিদ্য অন্তরিন্দ্রিয়বৃত্তিপ্রবাহো ধ্যানম্"—অদ্বিতীয় বস্তুর প্রতি চিন্তাস্রোত ছেদের মধ্যেও প্রবহমান থাকার নাম ধ্যান।

বিষ্ণুপুরাণের সংজ্ঞা এই—"তদ্রূপ প্রত্যয়ৈবৈকসন্ততিশ্চান্যনিস্পৃহা তদ্ধ্যানম্" ইত্যাদি (৬ষ্ঠ অংশ, ৫ম অধ্যায়, ৮৯ শ্লোক)। শ্রীধর স্বামী ইহার এইরূপ টীকা করিয়াছেন—"তদ্রূপস্য ধারণাসিদ্ধস্য বস্তুনঃ প্রত্যয়া যস্যাং সন্ততৌ সা একাবচ্ছিন্না সন্ততিঃ। অন্যনিস্পৃহা বিষয়ান্তরেণাব্যবধীয়মানা। বিজাতীয়প্রত্যয়ান্তরিতঃ সজাতীয়প্রত্যয়প্রবাহো ধ্যানমিত্যর্থঃ।" ইহার মর্ম্ম এই—ধারণাসিদ্ধ বস্তুর প্রতি চিত্তবৃত্তির একাবচ্ছিন্ন বিষয়ান্তরস্পৃহাশূন্য অর্থাৎ অন্য বস্তুর চিন্তাদ্বারা অব্যবহিত যে সমজাতিক বা সমধর্ম্মসম্পন্ন প্রবাহ ইহাই ধ্যান।

গরুড় পুরাণে ধ্যানের স্ফুটতর বর্ণনা এই—

"ধ্যেয়ে সক্তং মনো যস্য
ধ্যেয়মেবানুপশ্যতি।

* যে ব্যক্তি কোন বিষয়সমূহের ধ্যান করে তাহার তাহাতে আসক্তি উপজাত হয়।

নান্যং পদার্থং জানাতি

ধ্যানমেতৎ প্রকীর্ত্তিতম্ ॥

ধ্যেয়ে মনো নিশ্চলতাং

যাতি ধ্যেয়ং বিচিন্তয়ৎ।

তত্তদ্ধ্যানং পরং প্রোক্তং

মুনিভির্ধ্যানচিন্তকৈঃ ॥"

(পূর্ব্বখণ্ড, ২৪০ অধ্যায়, ৩০শ ও ৩১শ শ্লোক)

অর্থাৎ ধ্যেয় বস্তুতে যাহার মন আসক্ত থাকে, যে কেবল ধ্যেয় বস্তুই দর্শন করে (অর্থাৎ কেবল ধ্যেয় বস্তুই যাহার চিন্তার বিষয় হয়), যে অন্য পদার্থ জানেনা (অর্থাৎ যাহার অন্য কোন পদার্থের জ্ঞান থাকেনা), [তাহার চিত্তবৃত্তির] এই অবস্থাকে ধ্যান বলা হয়। ধ্যেয় বস্তুর চিন্তা করিতে করিতে মন সেই ধ্যেয় বস্তুতে নিশ্চলতা প্রাপ্ত হয়, ধ্যাননিরত মুনিগণ সেই অবস্থাকে ধ্যান বলিয়া থাকেন।

এইখানে একটী কথা বলা আবশ্যক। শ্রীমদ্ভাগবতাদি পুরাণে ও তন্ত্রে দেবতার স্তবস্তুতি ও গুণানুকীর্ত্তনকে ধ্যানশব্দে অভিহিত করা হইয়াছে, ইহা ধ্যান শব্দের গৌণার্থ প্রয়োগ।

এই পর্য্যন্ত ধ্যানের যে কয়টী সংজ্ঞা দেওয়া হইল তাহাতে যে-অদ্বিতীয়বস্তুর প্রতি চিত্তবৃত্তির একতান প্রবাহকে ধ্যান বলা হইয়াছে, সেই অদ্বিতীয় বস্তু কি তাহা বলা হয় নাই, তাহা ঈশ্বর বা ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য অভিমত বস্তুও হইতে পারে।

কিন্তু ধ্যানের তৃতীয় অর্থে ধ্যেয় বস্তু নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ইহার তৃতীয় অর্থ ব্রহ্মচিন্তন।*

"ব্রহ্মচিন্তা ধ্যানং স্যাৎ"—গরুড় পুরাণে (পূর্ব্বখণ্ড, ৪৯ অধ্যায়, ৩৮ শ্লোক) ধ্যানের এই সংজ্ঞা প্রদত্ত হইয়াছে।

গীতার ত্রয়োদশ অধ্যায়ের চতুর্ব্বিংশ শ্লোকে "ধ্যানেনাত্মনি পশ্যন্তি কেচিদ্ আত্মানমাত্মনা" † এবং মৈত্র্যুপনিষদের ষষ্ঠ প্রপাঠকের নবম অনুবাকে "ধ্যানং প্রয়োগস্থং মনো বিদ্বদ্ভিঃ স্তুতম্" ‡ এই বাক্যদ্বয়ে ধ্যানশব্দ এই অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে।

* যাঁহারা সাকারের উপাসনা করেন তাঁহাদের ধ্যানের সংজ্ঞা এইরূপ—"ধ্যানং রূপগুণক্রীড়াসেবাদেঃ সুষ্ঠু চিন্তনং।" (ভক্তি-রসামৃতসিন্ধু, পূর্ব্ববিভাগ, ২য় লহরী, ৭৭ শ্লোক)—উপাস্যের রূপ, গুণ, ক্রীড়া ও সেবাদির সুষ্ঠু চিন্তনের নাম ধ্যান। "বিশেষতো রূপাদি-চিন্তনং ধ্যানং" (ভাগবতের ৭।৫।১৮র ক্রমসন্দর্ভ টীকায় শ্রীজীব-গোস্বামী)—রূপাদির বিশেষরূপ চিন্তনের নাম ধ্যান। নারদপঞ্চরাত্র (১১।৭১) এবং শাণ্ডিল্যসূত্র (৬৫) প্রভৃতিতে এই সাকার ধ্যানের কথাই বলা হইয়াছে। অগ্ন্যাদি বহু পুরাণে সাকার ধ্যান ও ব্রহ্মধ্যান এই উভয় প্রকার ধ্যানের বর্ণনা আছে। আমাদের বক্তব্য বিষয় ব্রহ্মধ্যান।

† কেহ কেহ অর্থাৎ কোন কোন সাধক (উত্তম সাধক—মধুসূদন) (স্বীয়) আত্মার (বিশুদ্ধ অন্তঃকরণের) দ্বারা ধ্যানের সাহায্যে (স্বীয়) আত্মাতেই পরমাত্মাকে দর্শন করেন।

‡ প্রয়োগস্থ অর্থাৎ তত্ত্বে বা উপাসনায় নিবিষ্ট যে মন তাহাই ধ্যান, ব্রহ্মজ্ঞানিগণ এই ধ্যানেরই প্রশংসা করিয়া থাকেন।

গীতার ষষ্ঠ অধ্যায়ে ব্রহ্মধ্যানের অবস্থাকে এইরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে—

"সঙ্কল্পপ্রভবান্ কামাংস্ত্যক্ত্বা সর্ব্বানশেষতঃ।
মনসৈবেন্দ্রিয়গ্রামং বিনিয়ম্য সমন্ততঃ ॥২৪॥
শনৈঃ শনৈরুপরমেদ্ বুদ্ধ্যা ধৃতিগৃহীতয়া।
আত্মসংস্থং মনঃ কৃত্বা ন কিঞ্চিদপি চিন্তয়েৎ ॥"২৫॥

ইহার অর্থ এই—

সঙ্কল্পপ্রসূত সকল কামকে নিঃশেষে পরিত্যাগপূর্ব্বক মনের দ্বারা ইন্দ্রিয়সমূহকে সকল দিকে নিয়মিত করিয়া (অর্থাৎ সমুদয় ভোগ্যবিষয় হইতে প্রত্যাহরণ করিয়া), ধারণাবতী বুদ্ধির সাহায্যে ক্রমে ক্রমে উপরতি অবলম্বন করিবে (অর্থাৎ সর্ব্ববিষয় হইতে নিবৃত্ত হইবে) এবং মনকে আত্মাতে (অর্থাৎ ব্রহ্মেতে) সম্যক্ স্থিত করিয়া অন্য (অর্থাৎ আত্মাতিরিক্ত) কিছুই চিন্তা করিবে না।

উপনিষদে ধ্যানের এই তৃতীয় অর্থের একটী **বিশিষ্ট প্রয়োগ** দেখা যায়, সেইটী শুধু ব্রহ্মচিন্তা নয়, ব্রহ্মে মনের গভীর নিবেশ বা সংকেন্দ্রণ (concentration), অন্তরে ব্রহ্মসত্তার জীবন্ত উপলব্ধি, এক কথায় ব্রহ্মসাক্ষাৎকার, রাজর্ষি রামমোহনের ভাষায় আত্মসাক্ষাৎকার বা ব্রহ্মদর্শন। শ্বেতাশ্বতরোপনিষদের প্রথম অধ্যায়ের চতুর্দ্দশ শ্লোকে "ধ্যান-নির্ম্মথনাভ্যাসার্দ্ দেবং পশ্যেন্নিগূঢ়বৎ" (ইহার অর্থ 'অব-

তরণিকা'তে দ্রষ্টব্য) এই বাক্যে ধ্যান শব্দ এই অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। গীতার অষ্টাদশ অধ্যায়ের "ধ্যানযোগপরো···(৫২) ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে" (৫৩)—ধ্যানযোগপরায়ণ ব্যক্তি ব্রহ্মত্ব প্রাপ্তির (ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের—মধুসূদন) যোগ্য হন,—এই বাক্যেও ধ্যান শব্দের এই অর্থ। ব্রাহ্মসমাজের উপাসনাতে এই বিশেষ অর্থেই ইহার মুখ্য প্রয়োগ।

ছান্দোগ্যোপনিষদের সপ্তম অধ্যায়ের সপ্তম খণ্ডে ধ্যান-শব্দের এই ৩য় অর্থের **ব্যতিক্রম** এবং ইহার অনুরূপ অর্থে বিজ্ঞানশব্দের প্রয়োগ দৃষ্ট হয়, যথা "বিজ্ঞানং বাব ধ্যানাদ্ভূয়ঃ" (বিজ্ঞান ধ্যান অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ)। গীতার ৯ম অধ্যায়ের প্রথম শ্লোকে "'জ্ঞানং বিজ্ঞানসহিতং যজ্‌জ্ঞাত্বা মোক্ষ্যসেঽশুভাৎ"—বিজ্ঞান সহিত জ্ঞান, যাহা জানিলে তুমি অশুভ হইতে মুক্ত হইবে—এই বাক্যে বিজ্ঞানশব্দ অপরোক্ষানুভূতি বা প্রত্যক্ষব্রহ্মবেদন অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। ছান্দোগ্যের উক্ত উদ্ধৃত-স্থলে বিজ্ঞানশব্দের এই অর্থই মনে হয়।* ইহার এই অর্থে এবং ধ্যানশব্দের ৩য় অর্থে বিশেষ প্রভেদ দেখা যায় না।

* উদ্ধৃত স্থলের পরেই বিজ্ঞানকে ব্রহ্ম বলা হইয়াছে, কারণ ব্রহ্ম বিজ্ঞানময়, বিজ্ঞানাত্মা, বিজ্ঞানস্বরূপ। ভাষায় আধারের (thing contained এর) আধার (container) অর্থে প্রয়োগ প্রসিদ্ধ ও metonymy (লক্ষণা)-সম্মত।

২

ধ্যানের সোপান

ধ্যান বা ব্রহ্মদর্শনের ভূমিতে উপনীত হওয়ার সোপান-পরম্পরা সম্বন্ধে বৃহদারণ্যকের মৈত্রেয়ী ব্রাহ্মণে যাজ্ঞবল্ক্য মৈত্রেয়ীকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছেন—"আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রুতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যো মৈত্রেয়ি"—হে মৈত্রেয়ি, আত্মাকে দর্শন করিবে, শ্রবণ করিবে, মনন করিবে এবং ধ্যান করিবে। এইখানে আত্মা বলিতে জীবাত্মারই পূর্ণসত্যরূপ সর্ব্বাত্মা পরমাত্মার কথাই বলা হইয়াছে। গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে জীবাত্মার অমরত্বের কথা বলিতে যাইয়া "অবিনাশি তু তদ্বিদ্ধি যেন সর্ব্বমিদং ততম্"* এই বাক্যের দ্বারা এক অবিনাশী সর্ব্বব্যাপী আত্মার অর্থাৎ পরমাত্মার কথাই বলিয়াছেন। বাস্তবিক আত্মা একমাত্র বস্তু। তিনি ভূমা, তিনি সর্ব্ব, তিনি অবিচ্ছিন্ন। তাঁহার মধ্যে খণ্ডতা নাই। তিনি বিশ্বাতীত অথচ বিশ্বব্যাপী। তিনি একাই বহু। জীবাত্মা তাঁহা হইতে একান্ত স্বতন্ত্র বা একান্ত অভিন্ন নহে, কিন্তু তাঁহারই দেশকালের সীমাপরিচ্ছিন্ন অণু-প্রকাশ। রাজর্ষি রামমোহন রায় কর্ত্তৃক এই কথা এই ভাবে ব্যক্ত হইয়াছেঃ—"তোমাতে যে আত্মারূপে প্রকাশ, সেই

* যাহা দ্বারা এই সমুদয় অর্থাৎ জগৎ ব্যাপ্ত তাহাকে তুমি অবিনাশি জানিবে।—২য়, ১৭

ব্যাপ্ত চরাচরে।” ইহাই দর্শন-বিজ্ঞান-সম্মত প্রকৃত চরম তত্ত্ব। বস্তু একই, কিন্তু তাঁহার প্রকাশে ভূমা ও অণুর ভেদ আছে, সেইজন্য পরমাত্মা ও জীবাত্মার মধ্যে নিত্যভেদাভেদ সম্বন্ধ।

বৃহদারণ্যকের উক্ত উদ্ধৃত বাক্য সম্বন্ধে আচার্য্য শঙ্করের মন্তব্য এই—দর্শনের কথা অগ্রে বলা হইয়াছে বটে, কিন্তু ইহা লক্ষ্য (বা সিদ্ধির অবস্থা), আর শ্রবণ, মনন ও নিদি-ধ্যাসন এই তিনটী ব্রহ্মদর্শনের উপায় (বা সাধন)। শ্রবণ অর্থে “অশেষবেদান্তানাম্ অদ্বিতীয়বস্তুনি তাৎপর্য্যাবধারণম্” (বেদান্তসার)—অর্থাৎ অদ্বিতীয় বস্তু (ব্রহ্ম) সম্বন্ধে আচার্য্য (বা গুরু) এবং শাস্ত্রের (তত্ত্ববিদ্যার) উপদেশ ও তাহার তাৎপর্য্যগ্রহণ ; মনন অর্থে “শ্রুতস্য অদ্বিতীয়-বস্তুনো বেদান্তা-র্থানুগুণযুক্তিভিঃ অনবরতম্ অনুচিন্তনম্” (বেদান্তসার)—অর্থাৎ বেদান্তের অনুকূল যুক্তি বা বিচার সহ শ্রুত অদ্বিতীয় বস্তুর (ব্রহ্মের) অনবরত অনুচিন্তন ; আর নিদিধ্যাসন অর্থে অভিনিবেশপূর্ব্বক অনন্যমনে শান্তভাবে সেই অদ্বিতীয় বস্তুর (ব্রহ্মের) প্রগাঢ় চিন্তন। এই তিনটী সাধনের সংহতিতে ‘ব্রহ্মৈকত্ববিষয়ে’ অর্থাৎ ব্রহ্ম যে জীবাত্মা ও পরমাত্মা এই দুইরূপেই এক আত্মবস্তু এই তত্ত্বের সম্যক্ দর্শন হয়।

এই যে সাধন প্রণালী ইহা শম, দম, উপরতি, তিতিক্ষা, সমাধান ও শ্রদ্ধা এই ষট্‌সম্পত্তির অনুশীলনমূলক তপস্যা-সাপেক্ষ। শম বলিতে অন্তরিন্দ্রিয় সংযম বা মনের স্থিরতা ;

দম—বহিরিন্দ্রিয় সংযম ; উপরতি—বৈরাগ্য বা বিহিত কর্ম্মের ত্যাগ ; তিতিক্ষা—শীতোষ্ণাদি দ্বন্দ্ব সহিষ্ণুতা ; সমাধান—মনের স্থিরতা, সাম্যভাব বা সমাধিনিষ্ঠতা ; এবং শ্রদ্ধা বলিতে গুরু ও বেদান্ত-বাক্যে প্রত্যয় বা বিশ্বাস বুঝায়। এইরূপ তপস্যার ফলে সাধক "আত্মন্যেবাত্মানং পশ্যতি, সর্ব্বমাত্মানং পশ্যতি" (বৃহ, ৪।৪।২৩)—নিজের আত্মার মধ্যেই পরমাত্মাকে দর্শন করেন এবং সমুদয় বস্তুকে পরমাত্মরূপে দর্শন করেন। "এষ ব্রহ্মলোকঃ"—ইহাই ব্রহ্মলোক।

বৃহদারণ্যকের এই সাধন প্রণালীর শেষ ফল—দর্শন। যোগসূত্রকার পতঞ্জলি এই দর্শনকে অবলম্বন করিয়াই তাঁহার সংযমনামক ধারণা, ধ্যান ও সমাধি এই ত্রিবিধ অন্তরঙ্গ সাধনের অবতারণা করিয়াছেন বলিয়া অনুমিত হয়। ধারণা দর্শনের প্রথম স্তর, এবং ধ্যান ও সমাধি পর পর ইহার উন্নততর ও গভীরতর অবস্থা। পতঞ্জলি এই অবস্থাত্রয় লাভের পূর্ব্ববর্ত্তী একটী তপস্যাবিশেষের প্রয়োজনীয়তা নির্দ্দেশ করিয়াছেন,—ইহা যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম ও প্রত্যাহার এই পঞ্চ বহিরঙ্গ সাধন। এইগুলির সংজ্ঞা এখানে অবান্তর বলিয়া দেওয়া হইল না। ইহাদের সংজ্ঞা পাতঞ্জল দর্শনের সাধনপাদে ও বেদান্তসারে দ্রষ্টব্য।

পতঞ্জলির মতে ধারণা বলিতে "দেশবন্ধশ্চিত্তস্য" (বিভূতি-পাদ, ১)—'চিত্তকে দেশবিশেষে বন্ধন করিয়া রাখা' অর্থাৎ কোন বিশেষ বস্তুতে চিত্তের নিবেশ। চিত্ত বস্তুবিশেষে নিবিষ্ট

হইলে "তত্র প্রত্যয়ৈকতানতা" (বিভূতিপাদ, ২)—সেই ধারণীয় বস্তুর প্রতি চিত্তের যে একাগ্রতা বা অবিচ্ছিন্ন প্রবাহ তাহাই ধ্যান। আর "তদেবার্থমাত্রনির্ভাসং স্বরূপশূন্যমিব" (বিভূতিপাদ ৩)—অর্থাৎ চিত্তের যে একটা স্বরূপ বা স্বতন্ত্র স্বাধীন প্রকৃতি আছে সেইটা রহিতের মত হইয়া চিত্ত নিজেই যখন 'অর্থমাত্র' অর্থাৎ জ্ঞানপ্রবাহের বিষয়ীভূতরূপে প্রতীয়-মান হয় তখনই সমাধির অবস্থা।

অন্যত্র অন্যভাবে সমাধির ইহারই অনুরূপ সংজ্ঞা পাওয়া যায়, যথা—"অহং ব্রহ্মেত্যবস্থানং সমাধির্ব্রহ্মণঃ স্থিতিঃ" (গরুড়, পূর্ব্বখণ্ড, ৪৯ অধ্যায়, ৩৮ শ্লোক)—'আমি ব্রহ্ম' এই জ্ঞানে অবস্থানরূপ ব্রাহ্মী স্থিতি সমাধি। সমাধির এই সংজ্ঞাতে ধ্যাতা (অহং) ও ধ্যেয় (ব্রহ্ম) এই দুইয়ের ভেদের আভাস থাকিলেও তাহা পরিস্ফুট হয় নাই। কিন্তু ইহার অপর এক সংজ্ঞাতে অভেদ দর্শনের কথা থাকা সত্ত্বেও ভেদের স্পষ্টতর উল্লেখ আছে, যথা—

"পশ্যতি দ্বৈতরহিতং সমাধিঃ সোঽভিধীয়তে।
ধ্যেয়মেব হি সর্ব্বত্র ধ্যাতা তল্লবতাং গতঃ॥"

—(গরুড়, পূর্ব্বখণ্ড, ২৪০।৩২)

—ধ্যেয়ের সহিত ধ্যাতার দ্বৈতরাহিত্য অর্থাৎ অভেদ দর্শনই সমাধি ; সমাধিতে কেবল ধ্যেয়ই সর্ব্বত্র, ধ্যাতা তাঁহার অংশত্ব প্রাপ্ত। এখানে "তল্লবতাংগতঃ" (তাঁহার অংশত্ব প্রাপ্ত)

বলাতে সমগ্রত্ব প্রাপ্ত নয়, অর্থাৎ ধ্যেয় ও ধ্যাতার ভেদাভেদ সম্বন্ধ, ইহাই বুঝায়।

পতঞ্জলির সাধনতন্ত্রকে ব্রহ্মসাধনের বিধি বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। ইহা যে-কোন বস্তুতে মনঃসংযোগ ও তন্ময়ত্ব প্রাপ্তির সাধনসঙ্কেত। ইহাতে ঈশ্বরের স্থান গৌণভাবে থাকিলেও ব্রহ্মের স্থান একেবারেই নাই। "ঈশ্বরপ্রণিধানাৎ বা" (সমাধিপাদ, ২৩)—এই সূত্রের দ্বারা ঈশ্বরের স্থান ধ্যাতার ইচ্ছাধীন (optional) করা হইয়াছে।

পাতঞ্জল যোগসূত্রের লক্ষ্য উপনিষদের ব্রহ্মবাদের লক্ষ্য হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। ব্রহ্মবাদ ও পতঞ্জলির ঈশ্বরসম্বন্ধীয় ধারণা এক নহে। কিন্তু শাঙ্কর বৈদান্তিকগণ পতঞ্জলির যোগসূত্রকে ব্রহ্মযোগের অর্থাৎ ব্রহ্মসত্তার সাক্ষাৎ উপলব্ধি সাধনের সহায়রূপে গ্রহণ করিয়াছেন এবং এইরূপ গ্রহণ করিতে যাইয়া ধারণা, ধ্যান ও সমাধির সংজ্ঞা অনেক পরিমাণে পরিবর্ত্তিত করিয়াছেন।

'অপরোক্ষানুভূতি' গ্রন্থে (যাহা শঙ্করের রচিত বলিয়া ধরা হইয়া থাকে) ধারণার এইরূপ সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে—

"যত্র যত্র মনো যাতি ব্রহ্মণস্তত্রদর্শনাৎ।
মনসো ধারণং চৈব ধারণা সা পরা মতা॥"

—যাহাতে যাহাতে মন যায় তাহাতেই ব্রহ্মদর্শনে মনের যে সংযোগ বা নিবেশ তাহাই শ্রেষ্ঠ ধারণা।

ধারণার আরেকটী অনুরূপ সংজ্ঞা এই—

"ধ্যায়ন্ন* চলতে যস্য মনোঽভিধ্যায়তো ভৃশম্‌············ ·········সা ধারণা স্মৃতা" (গরুড়, পূর্ব্বখণ্ড, ২৪০।২৯)—ধ্যানের সময় ধ্যাতার মন নিশ্চয়ই বিচলিত হয় না, অর্থাৎ ধ্যেয় বস্তুতেই সংস্থিত থাকে, ইহাই ধারণা।

অগ্নিপুরাণে (৩৭৫।৩) আছে—

"ন প্রচ্যবতি যল্লক্ষ্যাদ্ধারণা সাভিধীয়তে।"

—মন লক্ষ্য হইতে কোন দিকে বিচলিত হয় না, কেবল ধ্যেয় বস্তুতেই নিবিষ্ট থাকে, ইহাকেই ধারণা বলা হয়। কাশীখণ্ডেও ইহার অনুরূপ সংজ্ঞা পাওয়া যায়।

কিন্তু বিষ্ণুপুরাণে যে সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে তাহা উৎকৃষ্টতর, তাহাতে পরব্রহ্মে মনের সংস্থিতিকে শুদ্ধধারণা বলা হইয়াছে। সেই সংজ্ঞাটী এই—

"তস্মাৎ সমস্তশক্তীনামাধারে তত্র চেতসঃ।
কুর্ব্বীত সংস্থিতিং সা তু বিজ্ঞেয়া শুদ্ধধারণা॥"

(৬।৭।৭৪)

—অতএব সমস্ত শক্তিসমূহের আধার যিনি তাঁহাতে অর্থাৎ পরব্রহ্মে মনের সংস্থিতি করিবে, এবং সেই সংস্থিতিকেই শুদ্ধধারণা বলিয়া জানিবে।

* 'ধ্যেয়ান্ন' ইতি পাঠান্তরং। উভয় পাঠে অর্থ সুস্পষ্ট

তাহা হইলে ধারণা বলিতে 'সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম' ছান্দোগ্যের এই মহাবাক্যের অন্তর্নিহিত তত্ত্বের সাক্ষাৎ উপলব্ধিকেই বুঝায়। অতএব বেদান্তসম্মত ধারণা সর্ব্বভূতে ব্রহ্মদর্শনের নামভেদ মাত্র। এই ধারণা বা সর্ব্বভূতে ব্রহ্মদর্শন যাঁহার হয়, শ্রীমদ্ভাগবতে তাঁহাকে ভাগবতোত্তম (শ্রেষ্ঠ ভাগবত) আখ্যা প্রদান করা হইয়াছে—

"সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যেদ্ভগবদ্ভাবমাত্মনঃ।
ভূতানি ভগবত্যাত্মন্যেষ ভাগবতোত্তমঃ॥" (১১।২।৪৫)

—যিনি সর্ব্বভূতেই আপনার ভগবদ্ভাব অর্থাৎ সকল ভূতের সহিত আপনার একাত্মতা দেখেন এবং আপনার আত্মারূপী বা অধিষ্ঠানরূপী ভগবানে সর্ব্বভূতকে দর্শন করেন, তিনিই উত্তম ভাগবত।

চৈতন্যচরিতামৃতে ভাগবতের এই শ্লোকের প্রতিধ্বনিস্বরূপ দুইটী অপূর্ব্ব শ্লোকের সন্নিবেশ অনেকেরই বিদিত, তাহা এই—

"মহাভাগবত দেখে স্থাবরজঙ্গম,
তাঁহা তাঁহা হয় তার শ্রীকৃষ্ণস্ফূরণ।
স্থাবরজঙ্গম দেখে না, দেখে তাঁর মূর্ত্তি,
সর্ব্বত্র হয় তার ইষ্টদেবে স্ফূর্ত্তি॥"*

(মধ্যলীলা, ৮ম পরিচ্ছেদ)

* 'সর্ব্বত্রে হয় নিজ ইষ্টদেব স্ফূর্ত্তি'—এইরূপ পাঠও দেখা যায়।

ধারণাতে যে দৃঢ়ানুবন্ধতা অর্থাৎ অচলভাবে লাগিয়া থাকা, যোগসূত্রে তাহাকেই ধ্যান বলা হইয়াছে। এইরূপ দৃঢ়ানুবন্ধতার ফলে এই হয় যে, মন ক্রমশঃ সমুদয় ইন্দ্রিয়-ক্রিয়ার বোধ ও সেই বোধের স্মৃতি (ও চিন্তা) হইতে নিবৃত্ত হইয়া এই বোধ ও স্মৃতি যে-সত্যবস্তুর প্রকাশ সেই সত্য-বস্তুতে গভীরভাবে নিবদ্ধ হয় এবং সেই সত্যবস্তুর সহিত স্বীয় আত্মার মৌলিক একত্ব উপলব্ধি করে ও সেই উপলব্ধিতে স্থিরপ্রতিষ্ঠ হইবার জন্য প্রয়াসী হয়। 'অপরোক্ষানুভূতি'তে এই প্রয়াসকে ধ্যান আখ্যা প্রদান করা হইয়াছে—

"ব্রহ্মৈবাস্মীতি সদ্বৃত্ত্যা নিরালম্বতয়া স্থিতিঃ।
ধ্যানশব্দেন বিখ্যাতা পরমানন্দদায়িনী॥"

—মনকে নিরালম্ব করিয়া অর্থাৎ অন্য বস্তুর চিন্তা হইতে বিযুক্ত বা নিবৃত্ত করিয়া 'ব্রহ্মৈবাস্মি' (আমি ব্রহ্মই) এই চিন্তাতে যে স্থিতি বা স্থিরপ্রতিষ্ঠা তাহাই ধ্যান নামে খ্যাত এবং ইহা পরমানন্দদায়িনী।

'আমি ব্রহ্মই' এই চিন্তার অনুশীলনের ফলে উপাসক ও উপাস্যের (জীব ও ব্রহ্মের) ভেদ একেবারে লুপ্ত হইয়া যায় বলিয়া যে নির্ব্বিকল্পসমাধিমতাবলম্বী নির্ব্বিশেষঅদ্বৈত-বাদী বৈদান্তিকগণ বলেন, তাহা জ্ঞানবস্তুর বিশ্লেষণ-বিরুদ্ধ কথা। ধ্যানের সর্ব্বোচ্চ অবস্থা যে সমাধি বা ব্রহ্মে মগ্নতা, তাহাতেও জ্ঞানের একান্ত বিলোপ হয় না, বেদান্তসারপ্রণেতা

যোগী সদানন্দ ইহা স্পষ্ট স্বীকার করিয়াছেন। সমাধি জ্ঞানগম্য অবস্থা না হইলে ইহার কোন অর্থ থাকে না, এবং জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়ের ভেদ ভিন্ন জ্ঞানক্রিয়া অসম্ভব। সমাধির আনন্দ সম্ভোগের বস্তু এবং এইজন্যই ইহা লোভনীয়। ভোক্তা ও ভোগ্যের ভেদ না থাকিলে সম্ভোগ অর্থহীন,— সম্ভোগ হইতে পারে না।

ব্যতিরেকী প্রণালীতে অর্থাৎ 'নেতি নেতি' (ইহা নয়, ইহা নয়), এই প্রণালী অবলম্বনে সমুদয় সসীমবস্তুকে ব্রহ্ম নয় বলিয়া জ্ঞান করিয়া অদ্বয়জ্ঞান বা আত্মবস্তুতে মনকে অচল-প্রতিষ্ঠ করা—এই ব্যতিরেক সমাধির কথাই 'অপরোক্ষা-নুভূতি'তে বলা হইয়াছে এবং গীতার ষষ্ঠ অধ্যায়ে প্রধানতঃ এই প্রণালী ব্যবহৃত হইয়াছে (যদিও শেষভাগে অন্বয় সমাধির কথাও আছে)। কিন্তু অন্বয় সমাধি ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর। গীতার একাদশ অধ্যায়ে আমরা এই প্রণালীর ব্যবহার দেখিতে পাই। ব্যতিরেকী প্রণালীতে অনাত্মবোধে যাহা কিছুর বর্জ্জন হয়, অন্বয়ী প্রণালীতে তাহার সমস্তই আত্মার প্রকাশ বা ব্রহ্মের বিশ্বরূপ বলিয়া গৃহীত হয়। ধর্ম্মকে শুধু নির্জ্জনে সাধনের ব্যাপার না করিয়া রাখিয়া দৈনন্দিন জীবনের প্রত্যেক বিভাগে, সমুদয় কর্ম্মক্ষেত্রে, জ্ঞান, ভাব ও ইচ্ছারূপিণী মনো-বৃত্তিসকলের পরিচালনে নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপারে পরিণত করিয়া সমগ্র জীবনকে নিয়মিত ও ক্রমবিকশিত এবং পরমা-নন্দসম্ভোগের বস্তু করিবার জন্য অন্বয়ী প্রণালীর একান্ত

প্রয়োজন। "সর্ব্বত্র তদীক্ষণম্" (সর্ব্বত্র ব্রহ্মদর্শন—৭।৭।৪৬), ভাগবতের এই নির্দ্দেশকে সাধনের দ্বারা জীবনে পরিণত করাই এই প্রণালীর লক্ষ্য এবং এই লক্ষ্যসিদ্ধিই একান্তভক্তির লক্ষণ ও মানবজীবনের পূর্ণ সার্থকতা। ইহাই অর্থাৎ জীবন ব্রহ্মময় হওয়া—অনুক্ষণ নিরবচ্ছিন্ন ব্রহ্মদর্শনের লীলাক্ষেত্র হওয়াই মোক্ষের বা সর্ব্ববন্ধনমুক্তির পূর্ব্বাস্বাদ। 'এষ ব্রহ্মলোকঃ'। এই অবস্থায় কর্ম্ম আর শুধু কর্ম্ম থাকে না, কর্ম্মযোগ হইয়া যায়, এবং জ্ঞান জ্ঞানযোগে, ভক্তি ভক্তি-যোগে, ধ্যান ধ্যানযোগে পরিণত হয়। সাংখ্য ও মায়াবাদী বৈদান্তিকগণ যে কৈবল্যের (কেবলতার, aloofness from the worldএর) অনুসরণ করেন, ইহা মৃগতৃষ্ণিকার অনু-সরণের ন্যায় অলীকের অনুসরণ, ইহা আকাশকুসুমবৎ কল্পনার বিজৃম্ভণ। আর নির্ব্বিকল্পসমাধিবাদ ও লয়বাদ বা শূন্যবাদে কোনও প্রভেদ নাই।

ধ্যান সম্বন্ধে শাস্ত্রের শিক্ষা এবং পূর্ব্বতন আচার্য্য গণের অভিজ্ঞতা এই দুইয়ের সার-সঙ্কলন সংক্ষেপে প্রদত্ত হইল।

৩

ব্রহ্মোপাসনায় ধ্যান।

এখন ব্রাহ্ম-সমাজের উপাসনাতে ধ্যানের স্থান ও প্রয়োগ কিরূপ নির্ণীত হইয়াছে তৎসম্বন্ধে কিছু বলিতেছি।

ব্রহ্মোপাসনাতে আরাধনার পরে ধ্যানের স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ইহাই সমীচীন। ধ্যানের ব্যাপারটী সম্যক্ বুঝিবার পূর্ব্বে আরাধনা সম্বন্ধে পরিষ্কার জ্ঞান থাকা আবশ্যক। আরাধনা যদি শ্রৌত বা পরম্পরাগত বিশ্বাস অথবা অনুমান-সিদ্ধ জ্ঞানমূলক হয়, তাহা হইলে সেই আরাধনাকে পরোক্ষ আরাধনা, আর যদি ব্রহ্মসত্তার সাক্ষাৎ উপলব্ধি বা ধারণামূলক হয়, তাহা হইলে ইহাকে প্রত্যক্ষ আরাধনা বলা যায়। প্রত্যক্ষ আরাধনায় ও শাস্ত্রোক্ত ধারণা-ধ্যানে কোন প্রভেদ নাই। ব্রহ্মোপাসনাতে যে আরাধনার পরে ধ্যানের স্বতন্ত্র স্থান নির্দ্দিষ্ট আছে এবং সেই স্থানে ইহার অনুশীলন অবশ্য প্রতিপাল্য বলিয়া ব্রাহ্মগণ মানেন, পরোক্ষ আরাধনা ও প্রত্যক্ষ আরাধনা এই উভয় পক্ষেই ইহার সমর্থন আছে। আরাধনা যদি পরোক্ষ হয়, তাহা হইলে সেই আরাধনা-লব্ধ উপলব্ধিকে সফলতামণ্ডিত করিবার জন্য সাক্ষাৎভাবে ভগবচ্চিন্তা বা ধ্যানের একান্ত প্রয়োজন। আর যদি আরাধনা প্রত্যক্ষ অর্থাৎ সাক্ষাৎ উপলব্ধি বা ধারণা ও ধ্যানমূলক হয়, তাহা হইলেও সেই সাক্ষাৎ উপলব্ধি বা ধারণা-ধ্যানকে গাঢ়তর ও

গভীরতরভাবে অনুশীলন ও সম্ভোগ করিবার জন্য আরাধনার পর ধ্যানের স্বতন্ত্র স্থান নির্দ্দিষ্ট থাকা অত্যাবশ্যক।

আরাধনাতে সাধকের মন ভগবানের একটী স্বরূপের চিন্তন হইতে অপর একটী স্বরূপের চিন্তনে সঞ্চরণ করে, কিন্তু ধ্যানে মনের এই সঞ্চরণ বন্ধ হইয়া যায়, এবং আরাধনাকালে স্বরূপচিন্তনের ফলে যে-অদ্বয় সত্যবস্তুর সাক্ষাৎকার হয়, ধ্যানের সময় মন সেই সত্যবস্তুতে নিবদ্ধ হইয়া নিশ্চল দৃষ্টিতে তাঁহাকেই দশন করে,—সম্ভোগের মাত্রা পূর্ণ হয়। আচার্য্য ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র আরাধনাকে বিশ্লেষ (analysis) এবং ধ্যানকে সংশ্লেষ (synthesis) আখ্যা দ্বারা বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি আরাধনাকে মধুমক্ষিকার মধু-অন্বেষণে পুষ্পে পুষ্পে বিচরণকালীন গুঞ্জনের সহিত এবং ধ্যানকে মধুপানকালীন নীরব মগ্নতার সহিত তুলিত করিয়া অতি সুন্দরভাবে এই দুইয়ের বৈশিষ্ট্য নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

আরাধনাতে চিত্তের গতি বা সঞ্চার ব্রহ্মমুখীন হয় এবং ক্রমে চিত্ত ব্রহ্মকে ধারণ করে অর্থাৎ সাক্ষাৎভাবে ধরে। ধ্যান সেই সঞ্চার ও ধারণাকে ব্রহ্মেতে তৈলধারাবৎ * অবিরাম

* ভগবদ্গীতার ১৩শ অধ্যায়ের ২৪শ শ্লোকের ভাষ্যে আচার্য্য শঙ্কর লিখিয়াছেন—"ধ্যানং নাম শব্দাদিভ্যো বিষয়েভ্যঃ শ্রোত্রাদীনি করণানি মনস্যুপসংহৃত্য মনশ্চ প্রত্যক্‌চেতয়িতরি একাগ্রতয়া যচ্চিন্তনং তদ্ ধ্যানম্। তথা ধ্যায়তীব বকো ধ্যায়তীব পৃথিবী ধ্যায়ন্তীব পর্ব্বতা

প্রবাহিত এবং দৃঢ়সংলগ্ন করিয়া ইহাকে অবিচ্ছিন্ন ও অবিচ্যুত রাখে।

আরাধনাতে ব্রহ্মস্বরূপের পর পর অনুশীলন ও চিন্তনের ফলে ব্রহ্ম ব্যক্তিরূপে প্রকাশিত হন, স্বরূপসমূহের সমষ্টীভূত একটা abstraction বা বস্তুনিরপেক্ষ, নিরালম্ব গুণসঙ্ঘাত রূপে নয়, সকল স্বরূপের আশ্রয়রূপী একজন concrete person বা বাস্তব, নিরবয়ব অথচ মূর্ত্ত পুরুষরূপে প্রকাশিত হন, এবং সেই পুরুষ বা ব্যক্তির সহিত সাধকের নানাপ্রকার মধুর সম্বন্ধ অনুভূত হয়। তিনি পিতা, মাতা, পতি, পুত্র, সখা, সুহৃৎ, স্বামী, প্রভু, গুরু, উপদেষ্টা প্রভৃতি বিবিধ বিচিত্র ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে সাধকের নিকট 'সুন্দরাৎ সুন্দরং', 'মধুরাৎ সুমধুরং' ইত্যাদি রূপে প্রকাশিত হইয়া সাধকের হৃদয় মন হরণ করেন। তাঁহার সঙ্গ ও সহবাস আর ছাড়িতে ইচ্ছা হয় না, মধুপাননিরত মক্ষিকার ন্যায় তাঁহাকে সম্ভোগ করিতে, তাঁহাতে ডুবিতে, তাঁহার সহিত নিত্যযুক্ত হইয়া যাইতে ইচ্ছা

ইত্যুপমোপাদানাৎ **তৈলধারাবৎ** সন্ততোঽবিচ্ছিন্নপ্রত্যয়ো ধ্যানম্।"—শব্দাদি বিষয়সমূহ হইতে শ্রবণ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গুলিকে মনেতে এবং মনকে আত্মাতে উপসংহৃত করিয়া একাগ্রতার সহিত যে চিন্তা তাহারই নাম ধ্যান। শাস্ত্রে এইরূপ উপমা আছে, যেমন 'বক যেন ধ্যান করিতেছে', 'পৃথিবী যেন ধ্যান করিতেছে', 'পর্ব্বত-সকল যেন ধ্যান করিতেছে'। তৈলধারার ন্যায় চিত্তবৃত্তির অবিচ্ছিন্ন প্রবাহই ধ্যান।

হয়। তিনি সর্ব্বত্রপাণিপাদ ও বিশ্বতোমুখ, দেশে ও কালে সর্ব্বত্র তাঁহার অনুপম ব্যক্তিত্ব, সুতরাং তিনি বিশ্বব্যাপী হইলেও তাঁহাকে ধারণা করা সহজসাধ্য। 'মুকুরে করিনিকুরম্বপ্রতিবিম্ববৎ'—দর্পণে হস্তিযূথের ছায়াপাত যেমন আশ্চর্য্য নহে, তেমনই আমাদের চিত্তও ভূমা মহান্ ব্রহ্মকে ধারণ ও ধ্যান করিতে সহজেই সক্ষম হয়, পরমকারুণিক পরমেশ্বর আমাদের চিত্তকে এমন করিয়াই গড়িয়াছেন। আরাধনা করিতে করিতে ভক্ত যখন তাঁহাতে মগ্ন হইয়া যান, তখন ভক্তবৎসল ভগবান্ ভক্তের চিত্তমুকুরে তাঁহার অনির্ব্বচনীয় অনিন্দ্যসুন্দর রস-রূপ ব্যক্তিত্ব লইয়া প্রকাশিত হন, তখন আর অনুমান নাই, কল্পনা নাই, সন্দেহ নাই, দ্বিধা নাই। ভক্ত সাক্ষাৎ ভগবৎ দর্শন লাভ করিয়া ধ্যানযোগে মত্তমধুকরের ন্যায় ব্রহ্মানন্দরসপানে বিভোর হইয়া, আত্মহারা হইয়া, তন্ময় হইয়া, আনন্দে ভরপূর হইয়া জীবন ধন্য করেন। এই ধ্যানযোগ সম্যক্ সাধিত হইলে, 'ব্রহ্মজ্ঞান, ব্রহ্মধ্যান, ব্রহ্মানন্দরসপান' মহাধ্যানতাপস মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গীতের এই বাণী, ব্রাহ্মধর্ম্মের এই পরম ও চরম লক্ষ্য সত্য হয়, সার্থক হয়, সফল হয়।

নবযুগে ধ্যানের আলোচনা, অনুশীলন ও অভিজ্ঞতা।

১

ধ্যান বিষয়ে রাজর্ষি রামমোহন।

যুগাচার্য্য রাজর্ষি রামমোহন রায় একজন মহা ধ্যানযোগী ছিলেন। তাঁহার পুরশ্চরণের কাহিনী নিরতিশয় বিস্ময়কর ব্যাপার। ইতিহাসে ইহার তুলনা নাই। তিনি ২২ বার পুরশ্চরণ করিয়াছিলেন। মহানির্ব্বাণতন্ত্রমতে এক এক বারের পুরশ্চরণে ৩২ হাজার বার জপ করিতে হয়। এইরূপ তপস্যার ফলে তাঁহার অনন্যসাধারণ কর্ম্মময় জীবন, বলিতে গেলে একটী বিরাট ধ্যানযোগে পরিণত হইয়াছিল। ধ্যান সাধনের জন্য তিনি তাঁহার রঘুনাথপুরের বাটীতে একটী ইষ্টক মঞ্চ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, অদ্যাবধি ইহার চিহ্ন বর্ত্তমান রহিয়াছে। তিনি অন্যের সহিত শকটারোহণে রাস্তায় চলিতে চলিতে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া ধ্যানস্থ হইয়াছেন, তাঁহার জীবনীতে এইরূপ ঘটনার উল্লেখ আছে।

রামমোহনের ভাষায় ধ্যানের বিশিষ্ট অর্থ কি, আমরা উপরে (৫ম পৃঃ) তাহা উল্লেখ করিয়াছি। তাঁহার রচিত গ্রন্থসমূহে তিনি ধ্যানের কথা নানাস্থানে নানাভাবে প্রকাশ করিয়াছেন। সেই সেই স্থানে তিনি প্রায়শঃ ধ্যান শব্দের ব্যবহার করেন

নাই, অন্যান্য (এক বা ততোধিক) শব্দের দ্বারা ইহার অর্থ ব্যক্ত করিয়াছেন। আমরা এইখানে তাহার কয়েকটী মাত্র স্থলের উল্লেখ করিতেছি।

তাঁহার বেদান্তগ্রন্থের ভূমিকায় তিনি লিখিয়াছেন, 'সমাধি বিষয় ক্ষমতাপন্ন হইলে সকল ব্রহ্মময় এমতরূপে সেই ব্রহ্ম সাধনীয় হয়েন।' এই উক্তিতে সমাধির অব্যবহিতপূর্ব্ব সাধন-স্তর ধ্যানকে স্বীকার এবং ধ্যানলব্ধ সমাধিমূলক উপাসনার শ্রেষ্ঠত্বকে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। অথবা 'সমাধি' শব্দ দ্বারা এখানে তিনি ধ্যানকেই লক্ষ্য করিয়াছেন, কারণ প্রচলিত অর্থে গৃহীত হইলে সমাধিতে উপাসনা থাকে না। প্রচলিত অর্থে সমাধি বলিতে ব্রহ্মের সহিত সাধকের ভেদজ্ঞানের অর্থাৎ উপাস্য-উপাসক সম্বন্ধের সাময়িক সম্পূর্ণ বিলোপ বুঝায়। কিন্তু বেদান্তসূত্রকারের মতে এই সম্বন্ধ কখনও বিলুপ্ত হয় না, এবং রামমোহনের ও এই মত। বেদান্ত-সূত্রকার বলিয়াছেন, "আপ্রয়াণাত্তত্রাপি হি দৃষ্টম্" (৪।১।১২)। এই সূত্রের রামমোহনের টীকা এই—'মোক্ষ পর্য্যন্ত আত্মোপাসনা করিবেক ; জীবন্মুক্ত হইলে পরেও ঈশ্বর উপাসনা ত্যাগ করিবেক না ; যেহেতু বেদে মুক্তি পর্য্যন্ত এবং মুক্ত হইলেও উপাসনা করিবেক, এমত দেখিতেছি।' "আদরাদলোপঃ" (৩।৩।৪১), এই সূত্রের টীকাতে তিনি লিখিয়াছেন, 'মুক্ত ব্যক্তির যদ্যপিও উপাসনার প্রয়োজন নাই তত্রাপি স্বভাবের দ্বারা আদরপূর্ব্বক উপাসনা করেন, এই হেতু

উপাসনার লোপ হয় নাই'। সুতরাং রামমোহনের উপরি-উদ্ধৃত বাক্যে সমাধি শব্দের ব্যবহার সম্ভবতঃ ধ্যান অর্থে হইয়াছে এই কথা বলা যাইতে পারে। শাস্ত্রে 'সমাধান' ও 'ধ্যান' অর্থে 'সমাধি' শব্দের প্রয়োগ অভিধানেও উক্ত আছে।

'বেদান্তসার' নামক নিবন্ধে "আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রুতব্যো মন্তব্যোনিদিধ্যাসিতব্যঃ" (বৃহ, ২।৪।৫), এই শ্রুতির অর্থ করিতে যাইয়া তিনি লিখিয়াছেন, 'আত্মাকে সাক্ষাৎকার করিবেক, শ্রবণ করিবেক, এবং চিন্তন করিবেক এবং ধ্যান করিতে ইচ্ছা করিবেক।' তৎপরে বেদান্তসূত্রের তৃতীয় অধ্যায়ের চতুর্থ পাদের ৪৭শ সূত্র উদ্ধার করিয়া তাহার ব্যাখ্যাতে লিখিয়াছেন, "ধ্যানের ইচ্ছা যে পর্য্যন্ত ব্রহ্মপ্রাপ্তি না হয় তাবৎ কর্ত্তব্য। নিদিধ্যাসন ব্রহ্মের সাক্ষাৎকারের ইচ্ছা করা। আর্থাৎ ঘটপটাদি যে ব্রহ্মের সত্তা দ্বারা প্রত্যক্ষ হইতেছে সেই সত্তাতে চিত্তনিবেশ করিবার ইচ্ছা করা, পশ্চাৎ অভ্যাসদ্বারা সেই সত্তাকে সাক্ষাৎকার করিবেক।"*

'ভট্টাচার্য্যের সহিত বিচার' নামক গ্রন্থে তিনি লিখিয়াছেন, "যখন অভ্যাসবশতঃ প্রপঞ্চময় বিশ্বের প্রতীতির নাশ হইয়া

---

* বেদান্ত গ্রন্থে এই সূত্রের টীকাতে তিনি নিদিধ্যাসন শব্দের অর্থ করিয়াছেন, 'আত্মার ধ্যানের ইচ্ছা', এবং লিখিয়াছেন 'ধ্যানের ইচ্ছা যে পর্য্যন্ত ভেদজ্ঞান থাকে তাবৎ কর্ত্তব্য।'

কেবল ব্রহ্মসত্তা মাত্রের স্ফূর্ত্তি থাকে, তাহাকেই আত্মসাক্ষাৎকার কহি।"

এই দুই গ্রন্থের উদ্ধৃত স্থলে আমরা দেখিতে পাই রামমোহন ধ্যান অর্থে অভ্যাস শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। গীতাতে ধ্যানকে অভ্যাস-যোগ বলা হইয়াছে।

'পথ্যপ্রদান' গ্রন্থে চতুর্থ প্রশ্নের উত্তরে 'জীব ও ব্রহ্মের ঐক্য চিন্তা', এই উক্তিতে 'চিন্তা' শব্দ ধ্যান অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।

'ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থের লক্ষণ' গ্রন্থে তিনি 'একমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্ম' ইত্যাদি উপনিষদ্বাক্যের অভ্যাস ও তদর্থচিন্তনের কথা বলিয়াছেন। এইখানে 'অভ্যাস ও তদর্থচিন্তন' এই সমগ্র কাথাটীর প্রয়োগ ধ্যান অর্থে।

'গায়ত্রীর অর্থ' নামক নিবন্ধের ভূমিকাতে তিনি একস্থানে লিখিয়াছেন, "শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসনের দ্বারা আত্মার সাক্ষাৎকার অর্থাৎ স্বরূপে অবস্থিতি করিবেক", এবং অন্য এক স্থানে লিখিয়াছেন, "গায়ত্রীতে 'ধীমহি' শব্দের দ্বারা জপাতিরিক্ত চিন্তা করিবার প্রতিজ্ঞা স্পষ্ট প্রাপ্ত হইতেছে।" এই দুই স্থলে 'নিদিধ্যাসন' ও 'জপাতিরিক্ত চিন্তা' ধ্যান অর্থে প্রযুক্ত। উক্ত গ্রন্থের অন্যত্র তিনি 'সর্ব্বভূতান্তরাত্মা'* জ্ঞানে ব্রহ্মকে অন্তর্যামিরূপে চিন্তা করার কথা লিখিয়াছেন,—এখানে 'চিন্তা' 'ধ্যানের' প্রতিশব্দ।

---

* (কঠ, ৫।৯,১০,১১,১২ ; শ্বেতা, ৬।১১)

মাণ্ডুক্যোপনিষদের ভূমিকাতে "পরমাত্মার পুনঃ পুনঃ চিন্তন" দ্বারা ধ্যানের ইঙ্গিত সুস্পষ্ট।

স্বয়ং ধ্যানযোগী হইয়া স্বীয় জীবনের সাধনে ধ্যানের মধুরতা সম্ভোগ এবং ইহার অবশ্যপ্রয়োজনীয়তা সাক্ষাৎ ভাবে হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন বলিয়াই তিনি ধ্যান সম্বন্ধে স্বরচিত গ্রন্থসমূহে এই ভাবে নানা স্থানে তাঁহার মত ও অভিজ্ঞতার মর্ম্ম লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন।

২

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের জীবনে ধ্যান।

আযৌবন-তপস্বী মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের জীবন ধ্যানযোগ সাধনের এক অপূর্ব্ব দৃষ্টান্ত। আভিজাত্য মর্য্যাদায় এবং ধনসম্পদে গৌরবান্বিত বংশে ভোগবিলাসের মধ্যে জন্মগ্রহণ করিয়া এবং গৃহী হইয়াও এই মহাপুরুষ সাধনবলে একজন নির্লিপ্ত, নির্ব্বিকার মহাধ্যানতাপস হইয়াছিলেন। ইঁহার অমৃতময় চরিতাখ্যান ও রচিত গ্রন্থাবলী পাঠ করিলে ইঁহার সাক্ষাৎ অপরোক্ষানুভূতি ও গভীর ধ্যানানুশীলনের পরিচয় পাইয়া পাঠককে তাঁহার চরণে স্বতঃই মস্তক নত করিতে হয়।

আমি সংক্ষেপে তাঁহার চরিতাখ্যান হইতে তাঁহার ধ্যানযোগ সাধনের বিবরণ সংগ্রহ করিয়া ধ্যানার্থী পাঠকগণের অবগতি ও সাহায্যের জন্য নিম্নে সন্নিবিষ্ট করিতেছি

এই সংগ্রহে শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্রচক্রবর্ত্তি-সম্পাদিত 'শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আত্মজীবনী' ও ৺অজিতকুমার চক্রবর্ত্তি-প্রণীত 'মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর' নামক চরিতাখ্যান আমার অবলম্বন।

(ক)

'শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন এই তিন অন্তরঙ্গ সাধনপ্রণালী মহর্ষির চিরজীবনের সম্বল ছিল।' কিরূপে এই সাধনের আরম্ভ ও অনুশীলন হয়, তাহা তাঁহার আত্মজীবনীতে লিপিবদ্ধ আছে। তিনি লিখিয়াছেন ঃ—

"পুরুষানুক্রমে আমরা গায়ত্রী মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া আসিতেছি। এই মন্ত্র আমাদের শিরায় শিরায়। উপনয়নের সময় যদিও আমি এই মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছিলাম, কিন্তু তাহা আমি ভুলিয়া গিয়াছিলাম। যেই আমি রামমোহন রায়ের উদ্ধৃত গায়ত্রী দ্বারা ব্রহ্মোপাসনার শ্রেষ্ঠত্ব দেখিলাম, অমনি তাহা আমার হৃদয়ে বিদ্ধ হইয়া গেল। আমি তাহার অর্থ আবৃত্তি করিয়া তাহারই জপেতে সাধ্যমত নিযুক্ত হইলাম।

গায়ত্রীর গূঢ় ভাবার্থ আমার মনে দিন দিন আরো প্রকাশ হইতে লাগিল। ক্রমে ক্রমে "ধিয়ো য়ো নঃ প্রচোদয়াৎ" আমার সমস্ত হৃদয়ে মিশিয়া গেল! ইহাতে আমার দৃঢ় নিশ্চয় হইল যে, ঈশ্বর আমাকে কেবল যে মূক সাক্ষীর ন্যায় দেখিতেছেন, তাহা নহে; তিনি অন্তরে থাকিয়া অনুক্ষণ আমার বুদ্ধিবৃত্তি-সকল প্রেরণ করিতেছেন। ইহাতে তাঁহার সহিত

এক ঘনিষ্ঠ জীবন্ত সম্বন্ধ নিবদ্ধ হইল। তাঁহাকে দূর হইতে প্রণাম করিয়াই পূর্ব্বে আপনাকে কৃতার্থ মনে করিয়াছিলাম; এখন সেই আশাতীত ফল প্রাপ্ত হইলাম যে, তিনি আমা হইতে দূরে নহেন, কেবল মূক সাক্ষী নহেন, কিন্তু তিনি আমার অন্তরে থাকিয়া আমার বুদ্ধি-বৃত্তি-সকল প্রেরণ করিতেছেন। তখন আমি জানিলাম যে, আমি অসহায় নহি, তিনিই আমার চিরকালের সহায়। যখন তাঁহাকে আমি না জানিয়া মুহ্যমান হইয়া ঘুরিতেছিলাম তখনও তিনি আমার অন্তরে থাকিয়া, ক্রমে ক্রমে আমার ভাল চক্ষু, জ্ঞান-চক্ষু, খুলিয়া দিলেন। এতদিন আমি জানি নাই যে, তিনি আমার হাত ধরিয়া আনিয়াছেন। এক্ষণে আমি জানিয়া তাঁহার হাত ধরিয়া চলিলাম।

এই অবধি আমি তাঁহার আদেশ শুনিবার শিক্ষা করিতে লাগিলাম। মনের প্রবৃত্তিই বা কি, তাঁহার আদেশই বা কি, এই দুয়ের পৃথক্ ভাব আমি বুঝিতে লাগিলাম। যাহা আমার প্রবৃত্তির কুটিল মন্ত্রণা বলিয়া বোধ হইতে লাগিল, তাহা পরিত্যাগ করিতে সযত্ন হইলাম, এবং তাঁহার আদেশ বলিয়া আমার ধর্ম্মবুদ্ধিতে যাহা প্রতিভাত হইতে লাগিল, তাহাতে আপনাকে নিয়োগ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলাম। তখন আমি তাঁহার কাছে প্রার্থনা করিতে লাগিলাম, "তুমি আমাকে শুভবুদ্ধি প্রেরণ কর, ধর্ম্মবল প্রেরণ কর; ধৈর্য্য দেও, বীর্য্য দেও, তিতিক্ষা সন্তোষ দেও।"

গায়ত্রী মন্ত্র অবলম্বন করিয়া কি আশার অতীত ফলই পাইলাম! তাঁহার দর্শন পাইলাম, তাঁহার আদেশ শ্রবণ করিলাম, এবং একেবারে তাঁহার সঙ্গী হইয়া পড়িলাম। তিনি আমার হৃদয়ে আসীন হইয়া আমাকে চালাইতেছেন, তাহা আমি বুঝিতে পারিলাম। তিনি যেমন আকাশে থাকিয়া গ্রহনক্ষত্রগণকে চালাইতেছেন, তেমনি তিনি আমার হৃদয়ে থাকিয়া আমার ধর্ম্ম-বুদ্ধি সকল প্রেরণ করিয়া আমার আত্মাকে চালাইতেছেন। যখনি নির্জ্জনে অন্ধকারে তাঁহার আদেশের বিপরীত কোন কর্ম্ম করিতাম, তখনই তাঁহার শাসন অনুভব করিতাম; তখনি তাঁহার "মহদ্ভয়ং বজ্রমুদ্যতং" (কঠ, ২।৩।৩) রুদ্র মুখ দেখিতাম, সকল শোণিত শুষ্ক হইয়া যাইত। আবার যখনি কোন সাধুকর্ম্ম গোপনে করিতাম, প্রকাশ্যে তিনি তাহার পুরস্কার দিতেন, তাঁহার প্রসন্ন মুখ দেখিতাম, সমুদয় হৃদয় পুণ্য-সলিলে পবিত্র হইত। আমি দেখিতাম যে, তিনি গুরুর ন্যায় নিয়ত আমার হৃদয়ে বসিয়া আমাকে জ্ঞান শিক্ষা দিতেছেন, সৎকর্ম্মে চালাইতেছেন। আমি বলিয়া উঠিতাম, "পিতা, তুমি মাতা, তুমি গুরু জ্ঞান দাতা।" দণ্ডেতেও তাঁহার স্নেহ দেখিতাম, পুরস্কারেও তাঁহার স্নেহ দেখিতাম। তাঁহার স্নেহেতেই পালিত হইয়া, উঠিতে পড়িতে, এতদূর আসিয়া পড়িয়াছি। তখন আমার বয়স ২৮ বৎসর।"

"ঈশ্বরের সাক্ষাৎ 'আদেশ' শুনিয়া প্রত্যেক কাজ করা, ইহার পর হইতে দেবেন্দ্রনাথের জীবনে নিঃশ্বাসপ্রশ্বাস লওয়ার

মত সহজ হইয়া গিয়াছিল। এমন কি বিষয়কর্ম্মের ব্যবস্থা করিতে গেলেও তিনি চোখ বুজিয়া ঈশ্বরসান্নিধ্যে কর্ত্তব্য স্থির করিয়া লইতেন।"—(অ, ১০৯ পৃঃ)

(খ)

আমি যখন পূর্ব্বে দেখিতাম যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মন্দিরের ভিতরে লোকেরা কৃত্রিম পরিমিত দেবতার উপাসনা করিতেছে, আমি মনে করিতাম, কবে এই জগন্মন্দিরে আমার অনন্তদেবকে সাক্ষাৎ দর্শন করিয়া তাঁহার উপাসনা করিব। এই স্পৃহা তখন আমার মনে অহোরাত্র জ্বলিতেছিল। শয়নে স্বপনে আমার এই কামনা, এই ভাবনা ছিল। এখন আকাশে সেই তেজোময় অমৃতময় (বৃহ, ২।৫) পুরুষকে দেখিয়া আমার সমুদায় কামনা পরিতৃপ্ত হইল এবং আমার সকল যন্ত্রণা দূর হইল।

আমি এতটা পাইয়া তৃপ্ত হইলাম, কিন্তু তিনি এতটুকু দিয়া ক্ষান্ত হইলেন না। এতদিন তিনি বাহিরে ছিলেন, এখন তিনি আমাকে অন্তরে দর্শন দিলেন, তাঁহাকে আমি অন্তরে দেখিলাম। জগন্মন্দিরের দেবতা এখন আমার হৃদয়-মন্দিরের দেবতা হইলেন, এবং সেখান হইতে নিঃশব্দ গম্ভীর ধর্ম্মোপদেশ শুনিতে লাগিলাম। যাহা কখনো আশা করি নাই, তাহা আমার ভাগ্যে ঘটিল! আমি আশার অতীত ফল লাভ করিলাম, পঙ্গু হইয়া গিরি লঙ্ঘন করিলাম। আমি জানিতাম না যে, তাঁর এত করুণা।

তাঁহাকে না পাইয়া আমার যে তৃষ্ণা ছিল, এখন তাঁহাকে পাইয়া তাহা শতগুণ বাড়িল। এখন যতটুকু তাঁহাকে দেখিতে পাই, যতটুকু তাঁহার কথা শুনিতে পাই, তাহাতে আর আমার ক্ষুধা তৃষ্ণা নিবৃত্তি হয় না। "যে ছেলে যত খায়, সে ছেলে তত লালায়।" "হে নাথ! তোমার দর্শন পাইয়াছি, তুমি আরো জাজ্বল্য হইয়া আমাকে দর্শন দাও। তোমার বাণী শুনিয়া কৃতার্থ হইয়াছি, তোমার আরো মধুর বাণী আমাকে শুনাও। তোমার সৌন্দর্য্য নবতররূপে আমার সম্মুখে আবির্ভূত হউক। তুমি এখন আমার নিকটে বিদ্যুতের ন্যায় আসিয়াই চলিয়া যাও, তোমাকে আমি ধরিয়া রাখিতে পারি না; তুমি আমার হৃদয়ে স্থায়ী হও,"—ইহা বলিতে বলিতে অরুণ-কিরণের ন্যায় তাঁহার প্রেমের আভা আমার হৃদয়ে আসিতে লাগিল। তাঁহাকে না পাইয়া মৃতদেহে, শূন্য হৃদয়ে, বিষাদ-অন্ধকারে নিমগ্ন ছিলাম। এখন প্রেম-রবির অভ্যুদয়ে আমার হৃদয়ে জীবনসঞ্চার হইল, আমার চিরনিদ্রা ভঙ্গ হইল, বিষাদ অন্ধকার চলিয়া গেল। ঈশ্বরকে পাইয়া জীবন-স্রোত বেগে চলিল, প্রাণ বল পাইল। আমার সৌভাগ্যের দিন উদয় হইল। আমি এখন প্রেম-পথের যাত্রী হইলাম। জানিলাম, তিনি আমার প্রাণের প্রাণ, হৃদয়-সখা, তিনি ভিন্ন আমার এক নিমেষও চলে না!

—(সঃ ১০১-২ পৃঃ)

(গ)

দিনের বেলায় গভীর ব্রহ্মচিন্তায় নিমগ্ন থাকিতাম। প্রতিদিন দুই প্রহর পর্য্যন্ত আমি দৃঢ় আসন-বদ্ধ হইয়া একাগ্রচিত্তে আত্মার মূল তত্ত্বের আলোচনা ও অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত থাকিতাম। অবশেষে আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলাম যে, যাহা মূল তত্ত্ব, তাহার উল্টা ভাবনা মনেতেও স্থান পাইতে পারে না ; তাহা কোন মনুষ্যের ব্যক্তিগত সংস্কার নহে, তাহা সকল কালে নির্ব্বিশেষে সর্ব্ববাদি-সম্মত ; মূল-তত্ত্বের প্রামাণিকতা আর কাহারো উপর নির্ভর করে না, তাহা আপনি আপনার প্রমাণ, তাহা স্বতঃসিদ্ধ, যেহেতুক ইহা আধ্যাত্মিক প্রজ্ঞাতে প্রতিষ্ঠিত।

এই মূলতত্ত্বের উপর নির্ভর করিয়া উপনিষদের পূর্ব্বকার ঋষিরা বলিয়া গিয়াছেন, "দেবস্যৈষ মহিমা তু লোকে, যেনেদং ভ্রাম্যতে ব্রহ্মচক্রং (শ্বেতা, ৬।১), পরম দেবেরই এই মহিমা যাঁহার দ্বারা এই বিশ্ব-চক্র ভ্রাম্যমাণ হইতেছে। কোন কোন পণ্ডিতেরা মোহে মুগ্ধ হইয়া বলেন, প্রকৃতির স্বভাবেতে জড়ের অন্ধ-শক্তিতে,—কেহ কেহ বা বলেন, কোন কারণ ব্যতীত কেবল কালেরই প্রভাবে, এই প্রকাণ্ড জগৎ চলিতেছে ; কিন্তু আমি বলি, পরম দেবেরই এই মহিমা, যাঁহার দ্বারা এই বিশ্ব-চক্র চালিত হইতেছে,—

"স্বভাবমেকে কবয়ো বদন্তি,
কালং তথান্যে পরিমুহ্যমানাঃ।

দেবস্যৈষ মহিমা তু লোকে,
যেনেদং ভ্রাম্যতে ব্রহ্মচক্রং ॥” (শ্বেতা, ৬।১)

“যদিদং কিঞ্চ জগৎ সর্ব্বং প্রাণ এজতি নিঃসৃতম্” (কঠ, ৬।২), যাহা এই কিছু, সমুদায় জগৎ, প্রাণস্বরূপ পরমেশ্বর হইতেই নিঃসৃত হইয়াছে, এবং প্রাণ-স্বরূপ পরমেশ্বরকে অবলম্বন করিয়া চলিতেছে। “এষ দেবো বিশ্বকর্ম্মা মহাত্মা, সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ (শ্বেতা, ৪।১৭)”, এই দেবতা বিশ্বকর্ম্মা মহাত্মা সর্ব্বদা লোকদিগের হৃদয়ে সন্নিবিষ্ট হইয়া আছেন।—মূলতত্ত্বের এই অকাট্য সত্যসকল ঋষিদিগের পবিত্র হৃদয়ের উচ্ছ্বাস।

সম্মুখে বৃক্ষ যে আছে, তাহাকে দেখিতেছি ও স্পর্শ করিতেছি। কিন্তু সেই বৃক্ষ যে-আকাশে আছে, সে-আকাশকে আমরা দেখিতেও পাই না, স্পর্শ করিতেও পাই না। কালে কালে বৃক্ষের শাখা হইতেছে, পল্লব হইতেছে, ফুল হইতেছে, ফল হইতেছে ; এ সকল দেখিতেছি। কিন্তু তাহার সূত্র সেই কালকে দেখিতে পাই না। বৃক্ষ যে জীবনী-শক্তির প্রভাবে মূল হইতে রস আকর্ষণ করিয়া আপনাকে পুষ্ট করিতেছে, যে শক্তি তাহার প্রতি পত্রের শিরায় শিরায় কার্য্য করিতেছে, সেই শক্তির প্রভাব আমরা দেখিতেছি ; কিন্তু সেই শক্তিকে আমরা দেখিতে পাই না। যে বিজ্ঞানবান্ পুরুষের ইচ্ছাতে বৃক্ষ এই জীবনী-শক্তি পাইয়াছে, তিনি তো এই বৃক্ষেতে ওতপ্রোত হইয়া রহিয়াছেন ; কিন্তু আমরা তাঁহাকে দেখিতে

পাই না। "এষ সর্ব্বেষু ভূতেষু গূঢ়োঽত্মা ন প্রকাশতে" (কঠ, ৩।১২), এই গূঢ় পরমাত্মা সর্ব্বভূতে, সকল বস্তুতে আছেন, কিন্তু তিনি প্রকাশিত হন না। ইন্দ্রিয়-সকল বাহিরের বস্তুই দেখে, অন্তরের বস্তুকে দেখিতে পায় না ; ধিক্ ইন্দ্রিয়সকলকে !

"পরাঞ্চি খানি ব্যতৃণৎ স্বয়ম্ভূ
স্তস্মাৎ পরাঙ্ পশ্যতি নান্তরাত্মন্।
কশ্চিদ্ধীরঃ প্রত্যগাত্মানমৈক্ষৎ
আবৃত্তচক্ষুরমৃতত্বমিচ্ছন্।" (কঠ, ৪।১)

স্বয়ম্ভূ ঈশ্বর ইন্দ্রিয়দিগকে বহির্ম্মুখ করিয়াছেন ; সেই হেতু তাহারা বাহিরেই দেখে, অন্তরাত্মাকে দেখে না ; কোন ধীর অমৃতত্বকে ইচ্ছা করিয়া মুদিত-চক্ষু হইয়া, সর্ব্বান্তর্গত এক আত্মাকে দেখেন।—এই উপদেশ শ্রবণ করিয়া, মনন করিয়া, নিদিধ্যাসন করিয়া, এই ব্রহ্ম-যজ্ঞ-ভূমি হিমালয় পর্ব্বত হইতে আমি ঈশ্বরকে দেখিতে পাইলাম ; চর্ম্ম-চক্ষুতে নয়, কিন্তু জ্ঞান-চক্ষুতে। আমার প্রতি উপনিষদের উপদেশ এই, "ঈশাবাস্য-মিদং সর্ব্বং" (ঈশা, ১), ঈশ্বরের দ্বারা এই সকল আচ্ছাদন কর ; আমি ঈশ্বরের দ্বারা এই সকল আচ্ছন্ন করিলাম।

"বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তম্
আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।"

(যজু.বা.মা. ৩১।১৮ ; শ্বেতা, ৩।৮)

আমি এই তিমিরাতীত আদিত্যবর্ণ মহান্ পুরুষকে জানিয়াছি! "এখন অবধি জ্যোতি আমার হৃদয় হইতে পৃথিবীতে ছড়াইব, যেহেতু আমি সূর্য্যেতে পঁহুছিয়াছি, ও অন্ধকার বিনাশ হইয়াছে!"—(স, ২৭০-২৭৩ পৃঃ)

(ঘ)

"আমি কখন কখন কোন নির্জ্জন পর্ব্বতের পার্শ্বস্থ শিলা-তলে বসিয়া ধ্যানে মগ্ন হইয়া এক বেলা কাটাইতাম। একদিন বেড়াইতে বেড়াইতে দেখি যে, একটা বনাকীর্ণ পর্ব্বতের মধ্য দিয়া একটা পথ চলিয়া গিয়াছে। আমি অমনি মনের সাধে সেই পথে চলিতে আরম্ভ করিলাম। তখন বেলা চারিটা বাজিয়াছে। আমি তন্মনস্ক হইয়া সেই যে চলিতে আরম্ভ করিলাম, তাহার আর বিরাম নাই; পদক্ষেপের উপর পদক্ষেপ করিতেছি, কিন্তু আমি তাহা জানি না। আমি কোথায় যাইতেছি, কতদূর এলাম, কতদূর যাইব, তাহার গণনা নাই। অনেকক্ষণ পরে একটী পথিককে দেখিলাম, সে আমার বিপরীত দিকে চলিয়া গেল। ইহাতে আমার ধ্যান ভাঙ্গিয়া গেল, আমাতে সংজ্ঞা আইল। আমি দেখি যে, তখন সন্ধ্যা হইয়াছে, সূর্য্য অস্ত গিয়াছে; আমার তো আবার এতটা পথ ফিরিয়া যাইতে হইবে। আমি দ্রুতবেগে ফিরিলাম। রাত্রিও দ্রুতবেগে আসিয়া আমাকে ধরিল। গিরি, বন, কানন সকলই অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া গেল। সেই অন্ধকারের দীপ হইয়া

অর্দ্ধচন্দ্র আমার সঙ্গে সঙ্গে চলিতে লাগিল। কোন দিকে সাড়া-শব্দ নাই, কেবল পায়ের শব্দ পথের শুষ্ক পত্রের উপরে খড়্ খড়্ করিতেছে। ভয়ের সঙ্গে সঙ্গে আমার মনের কি এক গম্ভীর ভাব হইল। রোমাঞ্চিত শরীরে সেই বনের মধ্যে ঈশ্বরের চক্ষু দেখিলাম,—আমার উপরে তাঁহার অনিমেষদৃষ্টি রহিয়াছে। সেই চক্ষুই সেই সঙ্কটে আমার নেতা হইল। নানা ভয়ের মধ্যে নির্ভীক হইয়া রাত্রি ৮টার মধ্যে বাসাতে পঁহুছিলাম। তাঁহার এই দৃষ্টি চিরকালের জন্য আমার হৃদয়ে বদ্ধমূল হইয়া রহিয়াছে। যখনি কোন সঙ্কটে পড়ি, তখনি তাঁহার সেই দৃষ্টি দেখিতে পাই।”

—(স, ২৮০ পৃঃ)

(৬)

“তোমার করুণা আমার মন প্রাণ হইতে কখনই যাইবে না। তোমার করুণা আমার মন প্রাণে এমনি বিদ্ধ হইয়া আছে যে, যদি আমার মস্তক যায়, তথাপি প্রাণ হইতে তোমার করুণা য়াইবে না।”—

“হাফেজের এই কবিতা পথে সমস্ত দিন উচ্চৈঃস্বরে পড়িতে পড়িতে তাঁহার করুণারসে নিমগ্ন হইয়া সূর্য্য অস্তের কিছু পূর্ব্বে সায়ংকালে সুঙ্ত্রী নামক পর্ব্বতচূড়াতে উপস্থিত হইলাম। দিন কখন চলিয়া গেল কিছুই জানিতে পারিলাম না। এই উচ্চ শিখর হইতে পরস্পর অভিমুখী দুই পর্ব্বত-

শ্রেণীর শোভা দেখিয়া পুলকিত হইলাম।" "সূর্য্য অস্তমিত হইল, অন্ধকার ভূবনকে ক্রমে আচ্ছন্ন করিতে লাগিল, তখনো আমি সেই পর্ব্বত শৃঙ্গে একাকী বসিয়া আছি।"

—(স, ২৬০ পৃঃ)

(চ)

দেবেন্দ্রনাথের অধ্যাত্মজীবনের প্রথম ধাপে তাঁহার অধ্যাত্ম-জীবনের উদ্বোধন ও তীব্র ব্যাকুলতা ও বেদনা। তখন তাঁহার যৌবন বয়স। বাহিরে তাঁহার দৃষ্টির উপর হইতে আবরণ উন্মোচিত হইয়া অনন্ত আকাশের মহিমা প্রসারিত হইল ; অন্তরে তাঁহার মুগ্ধ সংস্কার ঘুচিয়া নানা তত্ত্ব সকল স্ফুরিত হইল। দ্বিতীয় ধাপে, তাঁহার আত্মশোধন।—বিষয়-বৈরাগ্য এবং আপনাকে অশ্রান্তভাবে ধর্ম্মপ্রচারের কাজে নিয়োগ ; ক্রমশঃ বাহিরের দিকেও তাঁহার বিষয়সম্পত্তি গেল, আত্মীয়স্বজন তাঁহাকে পরিত্যাগ করিল। এমনি করিয়া একটা রিক্ততার সাধনা চলিতে লাগিল। তৃতীয় ধাপে, তাঁহার সমস্ত চৈতন্য পরিশুদ্ধ হইয়া ঈশ্বরের প্রেমে এবং সান্নিধ্যবোধে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল—তখন তাঁহার জ্ঞান প্রসন্ন হইল, হৃদয় নির্ম্মল হইল, এবং মন তাঁহাতে ধ্যায়মান হইল। তখনই তিনি মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি হইলেন এবং ব্রাহ্মধর্ম্মের বীজমন্ত্র ও ব্রাহ্মধর্ম্মগ্রন্থের গভীর মন্ত্রগুলিকে দর্শন করিলেন। তখন হইতেই তিনি ঈশ্বরের "আদেশবাণী"

শুনিতে লাগিলেন, তাঁহার প্রেরণা লাভ করিতে লাগিলেন। চতুর্থ ধাপে, কর্ম্মজালে তিনি যেমন নিবিড় ভাবে আপনাকে জড়াইয়া ফেলিয়াছিলেন, ক্রমশঃ তাহার বন্ধনগুলি আল্‌গা হইয়া আসিল এবং সমস্ত ছাড়িয়া দূরে নির্জ্জনতার মধ্যে ধ্যানের জন্য তাঁহার মন ব্যাকুল হইল। এই যে ধ্যানের অবস্থা—ইংরাজীতে যাহাকে Contemplation বলিয়া কতকটা বুঝাইবার চেষ্টা হয়, সে সম্বন্ধে একজন লেখকের একটী বেশ চমৎকার কথা আছে। তিনি লিখিতেছেন ঃ—"গায়কের কাছে যেমন স্বরসঙ্গতি (harmony), শিল্পীর কাছে যেমন রেখা ও বর্ণ, কবির কাছে যেমন ছন্দ ; তেমনি সাধকের কাছে এই ধ্যান একটা উপকরণ—যাহার ভিতর দিয়া তিনি সহজেই সেই শিবসুন্দরকে দেখিতে পান ও তাঁহার সহিত যোগযুক্ত হইতে পারেন।" কবি বা শিল্পী কোন সাধনার ভিতর দিয়া না গিয়াও রচনার উৎকর্ষ দেখাইতে পারেন বটে,—কিন্তু সাধনার ভিতর দিয়া গেলে তবেই তাঁহাদের রচনার সৌষ্ঠব পরিপূর্ণ হয়। সেইরূপ সাধক ধ্যান ধারণা যোগাভ্যাসের ভিতর দিয়া না গিয়াও সময়ে সময়ে খুবই উচ্চ অবস্থা লাভ করিতে পারেন—কিন্তু তাহা স্থায়ী হয় না। যখন এই ধ্যান ধারণার সাধনায় তিনি সিদ্ধ হন, তখনি তাঁহার চিত্ত সহজেই ঈশ্বরে সমাহিত হয়।

কবি ওয়ার্ড্‌স্‌ওয়ার্থ্‌ প্রকৃতির মধ্যে নিগূঢ় নিবিষ্ট চিত্তের এই ধ্যানের অবস্থার কথা বলিয়াছেন ঃ—

"We are laid asleep
In body, and become a living soul,
While with an eye made quiet by the power
Of harmony, and the deep power of joy,
We see into the life of things."

—আমাদের শরীর তখন সুপ্ত হইয়া যায়—আত্মা জাগ্রত হইয়া উঠে; আমাদের চক্ষু গভীর আনন্দ এবং সামঞ্জস্যের বোধের দ্বারা শান্ত হইয়া সকল বস্তুর অন্তরতর জীবনের মধ্যে নিবিষ্ট হয়।

এই যে অভিনিবেশ—যে অভিনিবেশের কথা বলিতে গিয়া আর এক জায়গায় ওয়ার্ড্‌স্‌ওয়ার্থ্‌ বলিয়াছেন যে, এই অবস্থায়—"Thought was not; in enjoyment it expired."—চিন্তাশক্তি আর ছিল না—তাহা আনন্দে বিলীন হইয়াছিল—সেই অভিনিবেশের ফলে বাস্তবিক ঐ অনির্ব্বচনীয় আনন্দ বা প্রেমই উদ্বেল হইয়া উঠে। সে গভীর আনন্দ যে কি, সে গভীর প্রেম যে কি, যে আস্বাদন করে নাই সে কেমন করিয়া বলিবে? আমরা তাহার কল্পনা মাত্র পাই, বস্তু তো পাই না। যে আনন্দে মত্ত হইয়া দেবেন্দ্রনাথ হাফেজের কবিতা আবৃত্তি করিতেন, বাস্তবিক সেই আনন্দেই—"Thought was not; in enjoyment it expired." একটী আরম্ভ, অন্যটী পরিণাম। ধ্যানে চতুর্দ্দিক হইতে চিত্তকে কুড়াইয়া আনিয়া সেই একে সংহত

সংযত করা হয়। আর আনন্দে সেই নিবিড় যোগোপলব্ধিকে দশদিকে উচ্ছ্বসিত করিয়া দেওয়া হয়। দেবেন্দ্রনাথের কাছে ধ্যানের সহায় ছিল উপনিষদ ; আনন্দের সম্বল ছিল হাফেজ।

কিন্তু এই ধ্যান ও আনন্দের ধাপেও দেবেন্দ্রনাথ ঠেকিয়া থাকিতে পারিলেন না। ফুল যখন ফোটে, তখন মনে হয় সেই বুঝি গাছের সাধনার চরম ধন ; কিন্তু ফল ফলিলে বুঝা যায় যে, ফুলের রং ও গন্ধ, ফুলের লাবণ্য ও মাধুর্য্য—ফলকেই প্রতীক্ষা করিয়াছিল। ফুল আপনাতে আপনি পূর্ণ পর্য্যাপ্ত ; কিন্তু ফলকে যে আপনাকে নিঃশেষে দান করিয়া দিতে হয়। সেই যে দান যজ্ঞ তাহাই অধ্যাত্মজীবনের চরমতা। ঈশ্বরে যোগযুক্ত আত্মা যখন স্বর্গলোক ছাড়িয়া মর্ত্ত্যে পিপাসিত আত্মাদের অমৃতবারি পরিবেষণ করিতে নামিয়া আসেন এবং আপনাকে বিলাইয়া দেন—তখনই তাঁহার সকল আনন্দের চরমতা ও স্বার্থকতা। অয়কেনের ভাষায় তখন এই সকল আত্মা "fruition of reality" সত্যের সফলতার অবস্থায় উত্তীর্ণ হন।

কিন্তু এই যে একবার সংসার হইতে উপরত হইয়া পুনর্ব্বার সংসারে প্রত্যাবর্ত্তন, এটা সকল সাধকের জীবনে দেখিতে পাওয়া যায় না। অনেকের জীবনে crucifixion পর্য্যন্ত হয়—অর্থাৎ একেবারে পরমাত্মাতে তাঁহারা আপনাকে বিলীন করিয়া এ জীবনে মরিয়া যান বটে। কিন্তু তারপরে

আর তাঁহাদের resurrection হয় না অর্থাৎ পুনর্ব্বার সেই মৃত্যুলোক হইতে ফিরিয়া আসিয়া যাহারা অধ্যাত্মজীবন না পাইয়া হাবুডুবু খাইতেছে, তাহাদের পরমবার্ত্তা জানাইবার আগ্রহ দেখা যায় না। সংসারের সমুদ্রে যে জল তরঙ্গিত হইতেছিল, অধ্যাত্মসূর্য্যের উত্তাপে সে জল বাষ্প হইয়া স্বর্গে গেল ; কিন্তু সেই বাষ্প যে প্রেমে জমাট বাঁধিয়া পুনরায় তপ্ত পৃথিবীর উপরে বর্ষিত হইলে তবেই তাহার চরম সার্থকতা, সে কথাটি কি আর তাহার মনে হয় ?

"মুক্তি ? ওরে মুক্তি কোথায় পাবি,
মুক্তি কোথায় আছে ?
আপনি প্রভু সৃষ্টি বাঁধন পরি
বাঁধা সবার কাছে।"

এ বাঁধন যে স্বয়ং ঈশ্বরকে নিজে পরিতে হইয়াছে, মানুষই কি মুক্ত হইয়া এ বাঁধন এড়াইয়া যাইতে পারে ? (অ, ২৬০—২৬৪ পৃঃ)

মহর্ষি তাঁর তপস্যালব্ধ সম্পদ নিজের মধ্যে আবদ্ধ না রাখিয়া বিতরণের জন্য তাহা লইয়া পুনরায় গৃহে প্রত্যাগত হইলেন।

(ছ)

মহর্ষির শেষ জীবনের ইতিহাস একবারে অন্তরঙ্গ ইতিহাস। এ একবারে "অকূল শান্তি, বিপুল বিরতি"র জীবনের

ইতিহাস ; এ অন্তরঙ্গ জীবনে একের সঙ্গে একের, স্তব্ধের সঙ্গে স্তব্ধের নিত্য নব মিলন-লীলা। এখানে সামাজিক জীবনের কোন বাষ্প মাত্র নাই।

কেমন করিয়া, কি প্রণালীতে, কোন্ সোপান বাহিয়া মানুষ বাহিরের হাজার আকর্ষণ-পাশ কাটাইয়া অন্তরের অন্তর-তম নিভৃততম লোকে প্রয়াণ করে এবং সেখানে আত্মার সঙ্গে পরমাত্মার মধুর-রসলীলা সম্ভোগ করিয়া ধন্য হয়—যুগে যুগে সাধকদের দ্বারা সেই প্রণালী, সেই পন্থা, সেই সোপানরাজি চিহ্নিত হইয়া গিয়াছে।

এই সাধনার পথ ধ্যানের পথ। ধ্যান মানে একটী নিবিড় অধ্যাত্ম নিবিষ্টতা, জ্ঞানের বিষয়ের মধ্যে একটি সব চৈতন্য-ডোবানো তন্ময়তা। জ্ঞানে যাহাকে জানি মাত্র, ধ্যানে তাহাকে প্রত্যক্ষ করি। ধ্যানের বিষয় মুখ্যত ব্রহ্ম হইলেও, যে কোন বস্তুকেই অবলম্বন করিয়া ধ্যানের ক্রিয়া চলিতে পারে। মন তো হাজার দিকে ছোটে, হাজার জিনিস তাহাকে টানে। সে সমস্ত টান সমস্ত ছোটাকে নিরোধ করিয়া একটী মাত্র বিষয়ের উপর যখন মনের দৃষ্টিকে সংহত করা যায়, সমস্ত চৈতন্যের আলো যখন একমুখীন হইয়া সেই বিষয়টারই উপর পড়ে, তখন তাহার সঙ্গে মনের একাত্ম সম্বন্ধ দাঁড়াইয়া যায়। তখনি কবি ব্লেক্ যে বলিয়াছেন যে, To see a world in a grain of sand, একটি বালুকণার মধ্যে এক জগৎকে দেখা যায়—সে কথা সত্য হয়। এই ধ্যানের প্রক্রিয়াই যখন

পরমাত্মার উপলব্ধির জন্য কাজ করে, তখন বাহিরের বিষয়ের মধ্যে যেমন তন্ময় হইলে তবে সেই বিষয়ের সঙ্গে একাত্মা হওয়া যায়, তেমনি করিয়াই পরমাত্মার ভিতরে তন্ময় হইতে হয়। প্রথম ক্রিয়ার সঙ্গে দ্বিতীয় ক্রিয়ার তফাৎ এই যে, প্রথম ক্রিয়া ভিতর হইতে বাহিরে যাওয়া, দ্বিতীয় ক্রিয়া বাহির হইতে ভিতরে আসা। ভিতর হইতে বাহিরে যাওয়া তত শক্ত নয়, বাহির হইতে ভিতরে আসাটা যত শক্ত। যে মনের বৃত্তিগুলার স্বাভাবিক গতি বাহিরের দিকে বিষয়ের দিকে, তাহাদের সেই গতিকে উল্টাইয়া অন্তর্মুখীন করার চেষ্টা। এ যেন গঙ্গার স্রোতকে সমুদ্রের দিক হইতে ফিরাইয়া গঙ্গোত্রীর দিকে চালাইবার চেষ্টার মত। ভিতরের দরজার সামনে একটি তর্জ্জনীর ইঙ্গিত নিশ্চল হইয়া আছে—বাহির হইতে যাহা কিছু বিঘ্ন আসিতে চায় সে সকলকে 'না' বলিয়া ফিরাইয়া দেয়।

১৮৭৫ সালে এক উপদেশে তিনি এই ধ্যানযোগ সম্বন্ধে নিজে লিখিতেছেন, "আত্মনি তিষ্ঠন্নাত্মনোঽন্তরঃ" (বৃহ)—তিনি আত্মাতে,—আত্মার অন্তরে আছেন। যেমন দূরে যাইতে হইলে শরীরে কষ্ট লইতে হয়, আত্মার অন্তরে যাইতে হইলে সেইরূপ মনের কষ্ট স্বীকার করিতে হয়। শারীরিক কঠোর তপস্যা অপেক্ষা মনের সংযম করা গুরুতর কৃচ্ছ্রসাধন। আর যে কোন উপায় অবলম্বন কর, মনঃসংযম ভিন্ন আত্মার মধ্যে পরমাত্মাকে দেখা যায় না। শান্ত দান্ত উপরত তিতিক্ষু

সমাহিত হইয়া, শুদ্ধসত্ত্ব হইয়া আত্মার মধ্যে পরমাত্মাকে দেখিতে হয়।”

হঠাৎ এই ভুল ধারণা মনে উঠিতে পারে যে, তবে বুঝি সাধনা “ইন্দ্রিয়ের দ্বার রুদ্ধ করি যোগাসনে” বসিবার সাধনা। “যা কিছু আনন্দ আছে দৃশ্যে, গন্ধে, গানে” তাহাকে অস্বীকার করিবার সাধনা। তা নয়, তা একেবারেই নয়। এ সাধনায় বাহিরকে রোধ করিয়া ভিতরে যাওয়া নয়—বাহিরকে ভিতরের দিকে লইয়া যাওয়া। বিচিত্রকে এক করা। বিচিত্রের বিচিত্র রস, একের অখণ্ড রস। এ সাধনা সেই অখণ্ড রসের উপলব্ধির সাধনা, সমস্ত বিচিত্র রসের স্বাদ সেই অখণ্ড রসের মধ্যে মিলাইয়া যায়। যাহা বিক্ষিপ্ত ছিল তাহাই গ্রথিত হয়। কবি কভেন্‌ট্রি প্যাট্‌মোর্‌ এই ধ্যানযোগের কথা বলিতে গিয়া বলিয়াছেন—এ যেন [প্রণয়ি-যুগলের] বাতি নিভাইয়া দিয়া বাহিরের দিক্‌কার পর্দ্দা টানিয়া দেওয়ার মত—এখানকার অন্ধকারটাই যে নিবিড় পরিচয়ের আলো।

উপনিষদের একটি বাক্যে এই ধ্যানের সোপানগুলি নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। সে বাক্যটি এই—শান্তো দান্তো উপরত স্তিতিক্ষু সমাহিতো ভূত্বা আত্মন্যেবাত্মানং পশ্যতি। পাশ্চাত্য মরমী (mystic) সাধনায় তিনটি মাত্র সোপানের কথা শোনা যায়—recollection, quiet, contemplation. অর্থাৎ প্রথম মনঃসংযোগের দ্বারা বিষয় হইতে নিবৃত্তি; দ্বিতীয় আত্মবিলোপের দ্বারা নির্ব্বিকার অবস্থা প্রাপ্তি; তৃতীয় ঈশ্বরের

সঙ্গে প্রেমের মিলন, হর্ষোচ্ছ্বাস ও রসস্ফূর্ত্তি। উপনিষদের বাক্যে শান্ত দান্ত ও উপরত হওয়ার অবস্থা পাশ্চাত্য মরমী সাধনার ঐ প্রথম অবস্থার সঙ্গে মেলে। তিতিক্ষু ও সমাহিত হওয়ার অবস্থা দ্বিতীয় অবস্থার সঙ্গে মেলে। তৃতীয় অবস্থার কথা উপনিষদে নাই, তাহা আমাদের দেশের ভক্তিমার্গের শাস্ত্রাদিতেই পাওয়া যায়। দেবেন্দ্রনাথ এই উপলব্ধির সন্ধান পাইয়াছিলেন—হাফেজে। সমাহিত হওয়ার পরেও যে একটা রসস্ফূর্ত্তি হয়, প্রেমের একটি অন্তরঙ্গ লীলা চলিতে থাকে, সে কথা বেদান্তে নাই। এইজন্য শেষ বয়সে দেবেন্দ্রনাথের সাধনায় হাফেজ যত সহায় ছিল, এমন উপনিষদ নয়।

প্রথম দুই অবস্থার অভিজ্ঞতা তাঁহার প্রথম বয়সেই ঘটিয়াছিল। শান্ত, দান্ত ও উপরত হওয়া এবং তিতিক্ষু ও সমাহিত হওয়ার যে ধ্যানের দরকার, বাহির হইতে ভিতরের দিকে যাইবার জন্য একটা প্রবল ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগের দরকার, সেটা তাঁহার পক্ষে সহজ হইয়া আসিয়াছিল। হিমালয় হইতে নামিবার সময় সেই ধ্যানশক্তিকে তিনি যথেষ্ট পরিমাণে অর্জ্জন করিয়া আসিয়াছিলেন। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় লিখিয়াছেন, "আচার্য্য কেশবচন্দ্রের মুখে শুনিয়াছি, তিনি একবার মহর্ষির সহিত নৌকাযোগে পদ্মানদীতে যাইতেছিলেন। একদিন দেখিলেন, মহর্ষি প্রাতে প্রাতরাশের পর নৌকা হইতে বাহির হইয়া নৌকার ছাদে পৃষ্ঠ দিয়া দাঁড়াইয়া নদী দেখিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে নয়ন মুদ্রিত করিয়া ধ্যানে মগ্ন

হইলেন। ঘণ্টার পর ঘণ্টা অতীত হইতে লাগিল, দিবা দ্বিপ্রহরে এক ভৃত্যের পর অপর ভৃত্য আসিয়া মস্তকে ছাতা ধরিতে লাগিল, মহর্ষির সে জ্ঞান নাই; আহারাদি পড়িয়া রহিল; ভিতরে আসিলেন না; চক্ষু মেলিলেন না। অবশেষে অপরাহ্নে চক্ষু খুলিলেন, তখন মনে হইল যে, নৌকার বাহিরে দাঁড়াইয়া আছেন।"

"একবার স্থির হইল যে, কোন্নগর ব্রাহ্মসমাজের উৎসবে সায়ংকালের উপাসনা মহর্ষি করিবেন। আমরা তৎপূর্ব্ব দিন কোন্নগরে গেলাম। সন্ধ্যাকালে মহর্ষি নৌকাযোগে স্বর্গীয় রাজনারায়ণ বসু মহাশয় ও নিজের জ্যেষ্ঠ পুত্র দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের সমভিব্যাহারে উপস্থিত হইলেন। উপাসনান্তে সকলের সহিত সমাসীন হইয়া প্রীতি-ভোজনে যোগ দিলেন। ভোজনান্তে নৌকাতে প্রতিনিবৃত্ত হওয়ার সময় রাজনারায়ণ বসু মহাশয় তাঁহার সঙ্গে না ফিরিয়া আমার শয্যাতে আসিয়া শুইয়া পড়িলেন; আমাকে বলিলেন, 'মহর্ষি যদি আমাকে ডাকেন আপনি গিয়া বলিবেন যে, আমি আর ফিরিয়া যাইব না, রাত্রে আপনাদের কাছেই থাকিব।' আমি বলিলাম 'সে কি ভাল দেখায়, তিনি আপনাকে ডাকিলেন, আর আপনি সঙ্গে যাবেন না?' বসু মহাশয় বলিলেন, 'কেন যাচ্চি না পরে আপনাকে বল্‌বো, আপনি বলুন না।' পরে তাহাই হইল, মহর্ষি যখন বসু মহাশয়কে ডাকিলেন তখন আমি গিয়া তাঁহাকে ছুটি করিয়া আনিলাম। শেষে শুনি মহর্ষি রবিবার

সন্ধ্যার সময় কোন্নগরে উপাসনা করিবার উদ্দেশ্যে শনিবার প্রাতে আহারান্তে নৌকাতে উঠিয়াছিলেন; তুই ঘণ্টার পথ তুই দিনে আসিবেন। সকলে অনুমান করিতে পারেন সে কি ব্যাপার! কিয়দ্দূর আসিয়াই হুকুম হইল, নৌকা নঙ্গর কর, তারপর মহর্ষি ধ্যানস্থ। সঙ্গীদ্বয় না পারেন কথা কহিতে, না পারেন নড়িতে চড়িতে। কয়েক ঘণ্টা পরে হুকুম হইল নঙ্গর তোল, আবার কথাবার্ত্তা চলিল; আবার কিয়দ্দূর আসিয়া হুকুম হইল নঙ্গর কর; আবার ধ্যানস্থ হইলেন। শনিবার সমস্ত রাত্রি নদীপার্শ্বে নঙ্গর করিয়া কাটিয়া গেল। রবিবারও ঐ প্রকার গতিতে আসা হইল। ইহার পরে বসু মহাশয়ের মহর্ষির সহিত ঐ গতিতে কলিকাতায় ফিরিবার উৎসাহ মন্দীভূত হইয়া গেল। নৌকাযাত্রার এই বিবরণ শুনিয়া আমরা সকলে.........মহর্ষির ধ্যানপরায়ণতার বিষয় স্মরণ করিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম।”

তাঁহার ধ্যানপরায়ণতার বিষয়ে এ রকমের গল্প বিস্তর শুনিতে পাওয়া যায়। এ একেবারে তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ হইয়া গিয়াছিল। এজন্যই তিনি বেশী দিন বা বেশী ক্ষণ মানুষের ভিড়ের মধ্যে থাকিতে পারিতেন না। নির্জ্জনবাস তাঁহার পক্ষে একান্ত দরকার হইত। এইজন্যই কখনো তিনি নৌকায় করিয়া নদীতে নদীতে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন, কখনো বোলপুরের জনহীন প্রান্তরে তাঁবু ফেলিয়া মাসের পর মাস কাটাইয়া দিতেছেন, কখনো হিমালয়ের তুর্গম শিখরে একাকী বছরের

পর বছর যাপন করিতেছেন। ভৃত্যেরা কেবল মধ্যে মধ্যে আহারের জিনিষ সাম্‌নে রাখিয়া যাইতেছে, আর সঙ্গ দিবার মত জনপ্রাণী নাই। (অ, ৫৩৩-৫৩৮ পৃঃ) !

(জ)

হিমালয় বাসকালে ভোর না হইতেই মহর্ষি বাহিরে এমন জায়গায় গিয়া বসিতেন যেখান হইতে সূর্য্যোদয় দেখা যায়। হিমালয়ের সেই প্রচণ্ড শীতে শীতবস্ত্র মুড়ি দিয়া বসিয়া সেই প্রাতঃসূর্য্যের উদয় দেখিতেছেন। তারপর উপাসনা। উপাসনার পর দুধ পান করিয়া তিনি ভ্রমণে বাহির হইতেন। বেড়াইয়া আসিয়া কোন গাছের তলায় ঈশ্বর চিন্তায় মগ্ন আছেন। দুপুরের সময় স্নান ও আহার করিয়া এক জায়গায় গিয়া বসিতেন এবং শোবার আগে পর্য্যন্ত একাসনে সেইখানে স্তব্ধ হইয়া বসিয়া আছেন। হঠাৎ যখন ধ্যানের মধ্যে তাঁহার ভিতরকার আধ্যাত্ম আনন্দের স্ফূর্ত্তি হইত, তখন গদ্‌গদ্ কণ্ঠে হাফেজের কবিতা বা উপনিষদ্ আবৃত্তি দ্বারা তাহা প্রকাশ করিতেন।

পাঞ্জাবের দেবসমাজের সংস্থাপক শ্রীমৎ সত্যানন্দ অগ্নি-হোত্রী কিছুকাল দেবেন্দ্রনাথের এই [হিমালয়স্থ] আশ্রমে থাকিয়া তাঁহার পত্রিকায় 'স্বর্গীয় দৃশ্য' নামে এক প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। তিনি যে স্বর্গীয় ছবির বর্ণনা করিয়াছিলেন, সে এই ধ্যানাসনে উপবিষ্ট দেবেন্দ্রনাথের ছবি। (অ, ৫৭৬ পৃঃ)

(ঝ)

দীর্ঘকাল বিচ্ছেদের পর পার্ক্ ষ্ট্রীটে প্রথম সাক্ষাতের সময় মহর্ষি কালীমোহন ঘোষ মহাশয়কে বলিয়াছিলেন, “এইক্ষণ দৃষ্টি ও শ্রবণশক্তি ক্রমে হ্রাস হইতেছে, বোধ হয় আর কিছুদিন পরে একেবারেই থাকিবে না। হৃদয়েশ্বর হৃদয়ে থাকিয়া সর্ব্বদাই যেন বলিতেছেন—‘তুই আমারই ইচ্ছায় অন্ধ ও বধির হইতেছিস্। সংসারের যা কিছু দেখা ও শুনা তোর শেষ হইয়াছে। দীর্ঘকাল এত দেখিয়া শুনিয়াও যদি তোর আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি না হইয়া থাকে তবে কখনও তোর বাসনা পূর্ণ হইবে না। এইক্ষণ কেবল আমাকে দেখ্ আর আমার বাণী শোন্।’ পরে একটী সংস্কৃত শ্লোক আবৃত্তি করিলেন, তাহার মর্ম্মও ঠিক এইরূপ।” (অ, ৫৯২ পৃঃ)।

(ঞ)

একবার উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় সাক্ষাৎ করিতে গেলে মহর্ষি তাঁহাকে প্রথমেই বলিলেন, “আমার চক্ষু ও কর্ণ দুই দ্বারই গিয়াছে, বাহিরে সব অন্ধকার। কিন্তু ভিতরের জ্যোতিতে আনন্দে আছি, এই জ্যোতি লইয়া যাইব।

(অ, ৬৩৭—৬৩৮ পৃঃ)

(ট)

মহর্ষি যে চাঁদ দেখিতে এত ভালবাসিতেন, কত রাত্রি যে তিনি শুধু চাঁদের দিকে তাকাইয়া তাকাইয়াই কাটাইয়া দিয়াছেন।

মহর্ষি যখন হিমালয়ে ছিলেন, যে রাত্রিতে ঈশ্বরের ঘনিষ্ঠ সহবাস অনুভব করিতেন, মত্ত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে হাফেজের এই বচন আবৃত্তি করিতেন। (অ, ৭১৩ পৃঃ)।
গজলটি ১০১ পৃষ্ঠার ফুটনোটে দ্রষ্টব্য

(ঠ)

দীর্ঘকাল হিমালয়ে বাসের পর গভীর চিন্তা ও ধ্যানের ফলে যখন তিনি আত্মা ও পরমাত্মার বিষয়ে বিমল জ্ঞান লাভ করেন, তখনকার আনন্দোচ্ছ্বাস, প্রথমতঃ উপনিষদের সেই অমৃতময় 'বেদাহমেতং' বচনের ও তৎপরে হাফেজের সেই উক্তির দ্বারা প্রকাশ করিলেন (আত্মজীবনী, ১৮৫ পৃঃ), "এখন অবধি আমি আমার হৃদয় হইতে পৃথিবীতে জ্যোতি বিস্তার করিব, কারণ আমি সূর্য্যলোকে পঁহুছিয়াছি ও দুঃখের অবসান হইয়াছে।" (অ, ৭১৬ পৃঃ)।

৩

ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের বাণী।

নববিধানাচার্য্য শ্রীমৎ ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন মধুলোলুপ ভৃঙ্গের ন্যায় ধ্যানপিয়াসী ছিলেন। ব্রাহ্মসমাজের উপাসনা-প্রণালীতে গভীর নীরব ধ্যানের বিধি তিনিই প্রবর্ত্তিত করেন। মহর্ষির সময়ে ধ্যানে শুধু গায়ত্রীর ব্যবস্থা ছিল। আরাধনাকালীন মগ্নাবস্থায় তিনি যে-সমুদয় ধ্যানের সঙ্কেত

ও সাধনপ্রণালীর উপদেশ করিয়া গিয়াছেন, সাধনক্ষেত্রে ইহাদের তুলনা নাই। এই অমূল্য রত্নরাজির বিশেষ বিশেষ কতিপয় হীরকখণ্ড উদ্ধার করিয়া নিম্নে উপহার দিতেছি। আশা করি ইহাতে অনেক ধ্যানার্থীর আত্মার উদ্বোধন ও তজ্জনিত প্রভূত কল্যাণ সাধিত হইবে।

ধ্যানের আয়োজন ও উদ্বোধন

(১)

কেশবচন্দ্র বলিতেছেন, "এখন আর বাহিরের আয়োজন করিতে হইবে না। এই সময়ের যাবতীয় আয়োজন আন্তরিক। যতগুলি আলোক আছে সমুদয় নির্ব্বাণ করিতে হইবে। ভিতরের বুদ্ধির আলোকটীও নির্ব্বাণ করিতে হইবে। সমস্ত অন্ধকার করিয়া লইতে হইবে। তখন অন্তরে বাহিরে চারিদিকে কেবল অমিশ্রিত, পূর্ণ ঘোরান্ধকার দেখিবে। ধ্যানার্থী মন সেই অন্ধকার আলিঙ্গন করিবে।"

সে সময় কি পৃথিবী, কি শরীর কিছুই মনে থাকে না। আর কিছু যখন রহিল না, সেই অন্ধকার মধ্যে এই আমি, আর সমক্ষে, পশ্চাতে, উর্দ্ধে, নিম্নে একটী প্রকাণ্ড সত্তা। একটী ক্ষুদ্র আমি, একটী প্রকাণ্ড তিনি। সেই একজন ভূমা, মহান, প্রকাণ্ড তিনি আমাকে পরিবেষ্টন করিয়া আছেন। সেই যে তিনি তাঁহাকে আস্তে আস্তে 'তুমি' করিতে হইবে।

এই আমি এই তিনি, এইটী **প্রথম সোপান**; এই আমি এই তুমি এই **পরের সোপান**। এই যে অমিশ্রিত আমার আত্মা, আর এই যে অমিশ্রিত পরমাত্মা, ধ্যানের সময় দেখিতে হইবে, এই দুইজন ভিন্ন আর কেহ নাই। যত উজ্জ্বল বিশ্বাস-নয়নে দেখিবে ততই বুঝিতে পারিবে, যেমন ওতপ্রোতভাবে বস্ত্র বুনা হয়, তেমনই উপর হইতে নিম্নে এবং নিম্ন হইতে উপরে ব্রহ্ম বাস করিতেছেন।

ধ্যানার্থী সাধকের সম্পর্কে প্রথমাবস্থায় তিনি, তারপর তুমি।

শেষাবস্থায় ঈশ্বরকে সাধক এই কথা বলেন—"তুমি আমার ভিতরে, আমি তোমার ভিতরে। তুমি আমা ছাড়া নহ, আমি তোমা ছাড়া নহি; তুমি আমার বাহিরে, আমি তোমার বাহিরে, তাহা নহে; কিন্তু তুমি আমার ভিতরে, আমি তোমার ভিতরে।" ধ্যান ক্রমে ঘন হইতে ঘনতর এবং গভীর হইতে গভীরতর হইলে, বাহিরের দুইজন ভিতরের দুইজন হয়। এই তুমি আমার বুকের ভিতরে, আমার ক্ষুদ্র আত্মার মধ্যে তুমি বৃহৎ আত্মা, তুমি আমার অনতিক্রমণীয়, সেই অবস্থায় সাধক এই কথা বলেন।

তার পর দেখিতে দেখিতে এই অনতিক্রমণীয় সত্তা নানা প্রকার সৌন্দর্য্যে অনুরঞ্জিত হয়। সেই যাহা পূর্ব্বে ঘোর অন্ধকার ছিল, তাহা একটী বৃহৎ সত্তায় পরিণত হইল। সেই সত্তা ঘন আনন্দের সমুদ্র হইল। আমার বুকের ভিতর কি?

আনন্দস্বরূপ। আমার প্রাণের ভিতর কি? প্রেমস্বরূপ। আমার অস্থির মধ্যে কি? পুণ্যস্বরূপ। ব্রহ্ম তুমি কোথায়? তুমি আমার ভিতরে ক্রীড়া করিতেছ, আমার আত্মা তোমার ভিতরে ক্রীড়া করিতেছে। **এই ধ্যানের উৎকৃষ্ট অবস্থা**। এই অবস্থায় সাধক সেই সুধা পান করিতে করিতে একেবারে মগ্ন হইয়া যান।"

—আচার্য্যের উপদেশ, ৭ম খণ্ড, ১ম সংস্করণ, ২৩৯ পৃষ্ঠা।

(২)

"প্রথমতঃ চিত্তের উত্তেজনা সমাহিত" করিতে হইবে। "ধ্যানের এক কারণ নিবৃত্তি, আর এক কারণ প্রবৃত্তি। বাসনা মনুষ্যকে ঈশ্বর হইতে দূরে লইয়া যায়। অতএব······বাসনা বিনাশ করিয়া সংসার ছাড়িয়া" যাইতে হইবে। "সংসারা-সক্তি নিবৃত্ত না হইলে ধ্যানের আরম্ভ হয় না। প্রবৃত্তি কি হইবে? আনন্দময়ের মনোহর রূপ দর্শন। ····· অন্তরের গাঢ়তম অন্ধকার ভেদ করিয়া একজন জ্যোতির্ম্ময় স্বর্গীয় পুরুষ বহির্গত হন, তাঁহাকে দেখিবার জন্য যে প্রবল প্রবৃত্তি তাহাই ধ্যানের একটী প্রধান সহায়।······আবার যেমন আলোকপ্রিয় হইয়া ধ্যাননিমগ্ন হইব, তেমনই ঈশ্বরকে রস-সাগর জানিয়া রসপিপাসু হইয়া তাঁহার সঙ্গে ধ্যান যোগ সাধন করিব। প্রাণের সমুদয় দুঃখ দূর হইবে যদি রস-সাগরে ডুবিতে থাকি। ধ্যানের এক শোভা ঈশ্বরের মুখ দেখা,

ধ্যানের আর এক শোভা তাঁহার স্নেহরস পান করা। ধ্যান-বলে যে কেবল সংসারাসক্তি নিবৃত্ত হয় তাহা নহে; কিন্তু যথার্থ ধ্যান সাধনে হৃদয় ব্রহ্মরসপানে প্রফুল্ল হয়। হৃদয়ের অভ্যন্তরে অন্তরাত্মার প্রসন্ন মুখ দেখিয়া……আত্মার চক্ষু বিমোহিত হয়, এবং তাঁহার সেই মুখের রসামৃত পান করিয়া……আত্মার কর্ণ সুশীতল হয়।……এই মুখ দেখিতে দেখিতে এমনই মত্ত হইয়া যাইবে যে, আর অন্য মুখের কামনা থাকিবে না। "কেমন তুমি যে এতকাল পর আসিলে? এই না তুমি আমাকে ছাড়িয়া সংসারে মজিয়াছিলে? এখন আমার প্রেমে মত্ত হইবার সময় কি আসিয়াছে? আমাকে ছাড়িয়া আর কোথাও কি যাইতে পারিবে?" তখন ব্রহ্মের চক্ষু এ সকল কথা জিজ্ঞাসা করিবে। সেই চক্ষু আমার পাষণ্ডতা চূর্ণ করিবে। যখন এইরূপে তাঁহার রূপে গুণে মোহিত হইব তখন ঠিক যোগী হইব। ক্রমাগত সেই রূপ-গুণ-সাগরে ডুবিয়া যাইব। নদীতে ডুবিলে যেমন শরীর শীতল হয়, ধ্যানের রাজ্যে প্রবেশ করিয়া, সেই রস-সাগরে ডুবিলে এই বহুকালের তাপদগ্ধ প্রাণ তখনই শীতল হইবে।"
—ধ্যানের উদ্বোধন, ১২ পৃঃ।

(৩)

• "ব্রহ্মোপসনার অন্যান্য অঙ্গের মধ্যে ব্রহ্মধ্যান অতি উৎকৃষ্ট অঙ্গ।" ……একটু পূর্ব্বকার কথা স্মরণ হইলে ভাব-যোগ

নিয়ম দ্বারা মন বিক্ষিপ্ত হইবে।......যতক্ষণ মন গাম্ভীর্য্য-বিহীন হইয়া লঘুভাব ধারণ করিয়া ইতস্ততঃ বেড়ায়, ততক্ষণ ধ্যান করিতে পারা যায় না। গুরুত্ব না থাকিলে কিছুতেই সাগরে ডুবে না, লঘুতাবিশিষ্ট মন ভাসে। যখন আপনার মনের ভিতরে ভার বুঝিতে পারিলে,—বিশ্বাসের ভার, প্রেমের ভার, অনুরাগের ভার,—জানিবে সেই অবস্থা ধ্যানের অনুকূল। ......"তুমি আছ, তুমি আছ, তুমি আছ" ধ্যানমন্দিরের যাত্রীদিগের ইহাই মূল সম্বল।......নিরবলম্বভাবে ঈশ্বরকে ধ্যান করিতে হইবে।......ঈশ্বরের ভিতর আমি, আমার ভিতরে ঈশ্বর। ব্রহ্মের সত্তার ভিতরে আমার সত্তা, আমার ক্ষুদ্র সত্তার ভিতরে ব্রহ্মের সত্তা। ব্রহ্ম-সাগরে আমি ওত-প্রোতভাবে ডুবিয়া আছি। আবার ব্রহ্ম ডুবিয়া আছেন আমার হৃদয়-সরোবরে।.....মহাসমুদ্রে নিক্ষিপ্ত আত্মা ডুবিয়া চলিল। চারিদিকে ব্রহ্ম-সাগরের তরঙ্গ, মধ্যে আমি। আমি আমার পিতাকে ধ্যান করিতে বসিলাম।"—(ধ্যানের উদ্বোধন, ৭৯ পৃঃ)।

(৪)

......ধ্যান কি সুমধুর।......

......ব্রহ্মনাম করা যেমন ভক্তিসাধনের একটী উপায়, ধ্যান দ্বারা হৃদয়ে সুধা বর্ষণ করা আর এক উপায়।......যে প্রদেশে যাইতেছ সেই দেশে অনেক রত্ন দেখিতে পাইবে,

অতএব প্রথমতঃ আশান্বিত হও। ধ্রুব বিশ্বাস, আশা ও আগ্রহের সহিত যাইবে। ম্লান-বদনে ধ্যান করিতে যাইবে না। প্রেম-ফুল লইয়া চক্ষুকে ভক্তিতে অনুরঞ্জিত করিয়া ধ্যানে প্রবৃত্ত হইবে। অতি সুন্দর দেশে যাইতেছ ইহা বিশ্বাস করিবে। আপাততঃ ব্রহ্মের মুখ ঢাকা। কিন্তু কেবল এই বর্ত্তমানতা দেখিয়া ক্ষান্ত হইলে চলিবে না। আরও চল, আকাশ ভেদ কর, দেখিবে তাহার ভিতর একজন পুরুষের বাস।……সেই নিরাকার পুরুষ তোমার পানে……তাকাইয়া আছেন, কেবলই চক্ষু। ব্রহ্মের নাম এখানে চক্ষু। চারিদিকে কেবলই জ্ঞানস্বরূপের নয়ন।…আবার চল, দেখিবে সেই পুরুষ দেখিতে দেখিতে অতি সুন্দর হইলেন। এই তৃতীয়বার তাঁহাকে দর্শন করিলে বলিবে আর ইঁহাকে ছাড়িয়া আমি যাইব না।…সত্যের আকাশ জ্ঞানস্বরূপ হইল, জ্ঞানস্বরূপ প্রেম এবং আনন্দে সুন্দর হইয়া প্রকাশিত হইল। সেই সুন্দর পুরুষ ক্রমাগত সুন্দরতর হইয়া, ধ্যান করেন যিনি, তাঁহার চক্ষুকে আরও টানিয়া লইতে লাগিলেন। সেই অবস্থায় ভক্ত ঈশ্বরের মুখে হাস্য দেখিতে পান। আনন্দস্বরূপ-ঈশ্বর সহাস্য মুখ ধারণ করিয়া যখন মনুষ্যের মন আকর্ষণ করেন তখন আর সে ফিরিয়া আসিতে পারে না। সত্যস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ এবং প্রেমস্বরূপ দেখিয়াও মানুষ তাঁহাকে ছাড়িয়া ফিরিয়া আসিতে পারে; কিন্তু চতুর্থবার যখন দেখে সেই পুরুষ ঘন প্রেম এবং ঘন আনন্দে অত্যন্ত সুন্দর হইয়া হাসিতেছেন, তখন আর

সে ফিরিয়া আসিতে পারে না। সেই যে তাহার চক্ষু আনন্দ-সাগরে ডুবিল, আর তাহা ফিরিল না, তাহার ভিতরেই রহিল। এই কয়টী কথা উপাসকগণ! তোমাদের ধ্যান পথের সহায় হউক। এই চারিটী পান্থশালা। কল্পনা আসিতে দিবে না, যেমন তিনি, ঠিক তেমনই তাঁহাকে দেখিবে। দেখিয়া যদি স্তব্ধ, শুদ্ধ এবং আহ্লাদিত না হও, সেই দেখা মিথ্যা। একটী তুড়ি দেওয়া মাত্র যেমন সমস্ত ভেল্কী উড়িয়া যায়, সেইরূপ চক্ষু নিমিলিত করিলেই দেখিবে ভয়ানক নিবিড় অন্ধকার আসিল, এই সুন্দর সভা, এই ব্রহ্মমন্দির, এই পৃথিবী কোথায় উড়িয়া গেল, একটী আলোকও নাই। জগদীশ্বর, জগদীশ্বর বলিয়া চলিলাম,……ক্রমাগত চলিতে চলিতে দেখিব পৃথিবী কত নীচে পড়িয়া রহিল। ইহলোক পরলোক এক হইয়াছে যেখানে সেখানে বসি। হস্তপদ সুস্থির করি, ইন্দ্রিয়দিগকে শান্ত করি। জগদীশ সহায়, জগদীশ সহায় বলিয়া সুখপ্রদ ধ্যানে নিমগ্ন হই।—

(ধ্যানের উদ্বোধন, ১৭৮ পৃঃ)।

(৫)

……কোন কোন ধর্ম্মসম্প্রদায়ের সাধকেরা শবের উপর বসিয়া সাধন করে। প্রকৃত ব্রহ্মধ্যানের সময়েও তাহাই করিতে হয়। ধ্যান করিতে হইলে এই কোলাহলময় পৃথিবীকে

মারিতে হইবে। এবং সেই মৃতের বুকে বসিয়া গম্ভীরভাবে ধ্যানের মন্ত্র উচ্চারণ করিতে হইবে।......

ধ্যানের সময় যাহা কিছু মৃত এবং অসার দেখি তাহা এই পৃথিবী এবং যাহা কিছু সার দেখি তাহা ঈশ্বর। ধ্যানের সময় দেখি মৃত্যুর মধ্যে নবজীবন, অন্ধকার মধ্যে আলোক, কঠোর বৈরাগ্যের মধ্যে প্রসন্নতাপূর্ণ বৈরাগ্য, অসারতার মধ্যে ঈশ্বরের অধিবাস। ধ্যানের শক্তিতে এই সকল নরনারী একবার মরিল আবার বাঁচিল। মানুষ কেহ নহে, ঈশ্বর ছাড়া সকলেই অপদার্থ। ব্রহ্মযোগে এ সকল বস্তু সার হইল। ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত স্থানে, সমস্ত আকাশে, ব্রহ্মের ব্যাপ্তি। তাঁহার ব্যাপ্তি ভিন্ন আর কিছুই নাই, আর সকলই অসার। সেই ব্যাপ্তিতেই সকলের অস্তিত্ব। কিন্তু যিনি জানেন ব্রহ্মে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া এই পৃথিবী সার, তিনিই কেবল বলিতে পারেন এই পৃথিবী অসার।

যাহারা ব্রাহ্ম নহে তাহারা বলে, ব্রাহ্মেরা চক্ষু বুজিয়া কেবলই অন্ধকার দেখে, উন্মাদের ন্যায় ইহারা শূন্যের মধ্যে বস্তু কল্পনা করে। আমি বলি ব্রাহ্মেরা উন্মাদ নহে, ইহাদের জ্ঞান চৈতন্য আছে, ইহারা অন্ধকার মধ্যে সার বস্তু দেখে। সাধন কর, উপলব্ধি কর, তবে অন্ধকার মধ্যে ব্রহ্মের জ্বলন্ত সত্তা দেখিবে। ধ্যানের পথ বিজ্ঞানের পথ। ইহাতে কল্পনা নাই, অসত্য নাই, ইহা যথার্থ পূর্ণ সত্যের পথ। এবং ধ্যানের পথ কঠোর নহে, ইহাতে মিষ্টতা আছে, সুধা

আছে। পাঁচ মিনিট ধ্যানে নিমগ্ন হইলে ব্রাহ্মদিগকে ধ্যান-সাগর হইতে টানিয়া আনা কঠিন হইবে। ধ্যানের মধ্যে এত আমোদ, এত সৌন্দর্য্য !—(ধ্যান, ২১২ পৃষ্ঠা)।

(৬)

সাধনের অতি উচ্চ অবস্থা ধ্যান।......ধ্যান-স্পৃহা কখন হয় ? যখন মানুষ আপনাকে জিজ্ঞাসা করে, এই যে তুমি ঈশ্বরকে এত ডাক, অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া কি বলিতে পার, ঐ আমার ঈশ্বর ? মনুষ্য যখন পরিত্রাণের জন্য ব্যাকুল হয়, তখন জীবন্ত ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষভাবে না দেখিলে তাহার কিছুতেই শান্তি হয় না। ঈশ্বরকে দর্শন করিবার জন্য তাহার প্রাণ কাঁদে, তাঁহার প্রেম-বারি পান করিবার জন্য অন্তর তৃষিত হয়। যখন সে তাঁহার দর্শন-লাভ করে তখন দীপ্ত-শিরার অভিষেক হয়। এই ব্যাকুলতার অবস্থায় যাহারা যথার্থ নিরাকার ঈশ্বরে বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারে না, তাহারা কল্পিত দেবতার পুত্তল নির্ম্মাণ করিয়া স্ব স্ব ঈশ্বর-দর্শন-স্পৃহা চরিতার্থ করে, এই জন্যই পৃথিবীতে পৌত্তলিকতার সৃষ্টি হয়।

ব্রাহ্মগণ, যথার্থ ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষরূপ দর্শন এবং ধ্যান করিয়া তোমার যদি এই অভাব মোচন না কর, তোমাদিগকেও একদিন পৌত্তলিক হইতে হইবে। মনুষ্যের মন স্বভাবতঃ এমন একটী লোক চায় যাঁহার আশ্রয় গ্রহণ অথবা যাঁহাকে ধারণা করিয়া সুস্থির হইতে পারে ; যাঁহার শ্রীপাদপদ্মে মস্তক

রাখিয়া নির্ভয় হইতে পারে এবং যাঁহার শ্রীমুখের দিকে তাকাইয়া প্রাণ শীতল করিতে পারে। ঈশ্বর, ঈশ্বর বলিয়া দশবৎসর কাঁদিলাম অথচ কোন বস্তু ধারণ করিতে পারিলাম না, অন্তরে বাহিরে শূন্য পরিহাস করিতে লাগিল, এই অবস্থায় কেহই ধর্ম্মজীবন লাভ করিতে পারে না। কিন্তু যখন অন্তরে এই শূন্যতা বোধ হয়, তখন ধ্যান আরম্ভ হয়। চারিদিকে রাশি রাশি বিষয় বৈভব রহিয়াছে সত্য, কিন্তু পরিত্রাণার্থীর নিকটে এ সমস্ত অসার এবং মিথ্যা। তাঁহার প্রাণের মধ্যে এই অনন্ত সৃষ্টি একটী প্রকাণ্ড শূন্য এবং ভয়ঙ্কর অন্ধকার বোধ হয়। এই যে শূন্য-বোধ ইহা ধ্যান-স্পৃহা জন্মাইয়া দেয়। মন স্বয়ং নিরাকার, অতএব স্বভাবতঃই ইহা নিরাকারের পক্ষপাতী। যখন এই ধ্যান-স্পৃহা প্রবল হয় তখন মন আপনা আপনি সমস্ত সাকার জগৎ পরিত্যাগ করিয়া, সেই ঘোর অন্ধকারময় নিরাকার অন্তর্জগতে প্রবেশ করে।

জলের ভিতরে নিমগ্ন হইলে যেমন সমস্ত শরীর জলে পূর্ণ হয়, সেইরূপ নিরাকার ব্রহ্ম-সাগরে মগ্ন হইলে আত্মার পূর্ণাবস্থা হয়।............

যখন অসত্য হইতে সত্যস্বরূপ ব্রহ্মের সত্তা-সাগরে প্রবেশ করিলাম, তখনই শুষ্ক শূন্য আকাশ প্রেমময়ের আবির্ভাবে পূর্ণ। আকাশ পূর্ণ হইল, ক্রমাগত সাধন দ্বারা শূন্য পূর্ণ ঈশ্বরের অস্তিত্বে পরিণত• হইল। তখন আর শূন্য পরিহাস করিতে

পারে না, শূন্যের মৃত্যু হইয়াছে। শূন্যের পরিবর্তে পূর্ণ ব্রহ্ম আসিয়াছেন।

[মন যখন তার শূন্য-ভাব উপলব্ধি করে তখনই] "একটী সত্য বস্তু লাভ করিবার জন্য" সে 'আকুল হয়'। "এই আকুলতাই ধ্যান-স্পৃহার উৎপত্তির কারণ।"..........."শূন্য বোধ করা ভয়ানক যন্ত্রণার অবস্থা। এই অবস্থায় কেহই অধিকক্ষণ থাকিতে পারে না। এই শূন্য যন্ত্রণায় উত্তপ্ত আত্মা হয়ত কল্পনার আশ্রয় করে, নতুবা স্বভাবতঃ নিরাকার ব্রহ্ম-সাগরে নিমগ্ন হয়। যখন ইহা যথার্থ ঈশ্বরকে লাভ করে তখনই প্রকৃত ধ্যানের জয়ধ্বনি হয়।"

"ব্রহ্মের সত্তা অনুভব করাই ধ্যান।.........

হস্ত দ্বারা যেমন জড় চরণ ধারণ করা যায়, তেমনই আত্মার দ্বারা নিরাকার ঈশ্বরের নিরাকার চরণ স্পর্শ করা যায়। আমরা যেমন পরস্পরের মুখ চক্ষু দেখি, তেমনই ঈশ্বরের প্রেম-মুখ এবং প্রেম-চক্ষু দেখা যায়। দেখা যায় এই কথা যদি বলিতে না চাও, অনুভব করা যায় এই কথা ব্যবহার কর। যোগী ব্রহ্ম-দর্শন অথবা ব্রহ্ম-ধ্যান করেন অর্থাৎ পরম সত্য ব্রহ্মকে অনুভব করেন। তিনি আহ্লাদের সহিত চীৎকার করিয়া বলেন ঃ—"আমি এই সত্য ধারণ করিয়াছি, এই সত্যে আমার প্রাণ পূর্ণ হইয়াছে।" কেবল ধ্যানশীল মনুষ্যই দৃঢ়তার সহিত ঈশ্বরের এইরূপ পরিচয় দিতে পারেন।.........ঈশ্বর তাঁহার করতল-ন্যস্ত ধৃত-বস্তু। ধ্যানপরায়ণ যোগীর সমস্ত

আত্মা ব্রহ্মময়। যাঁহারা সরোবরে অবগাহন করেন, তাঁহারা যেমন বুঝিতে পারেন যে, তাঁহাদের সর্ব্বাঙ্গ জলময়, তেমনই যাঁহারা ধ্যান করেন তাঁহারা অনুভব করিতে পারেন তাঁহাদিগের প্রাণ ব্রহ্ম-সত্তায় পরিপূর্ণ। যখন এই প্রকার অনুভব দ্বারা বলি "ঈশ্বর আছেন" তখনই প্রকৃত ধ্যান আরম্ভ হয়।

(ধ্যান—২১৬ পৃঃ)

(৭)

"অনেকে মনে করেন ধ্যান বহু-আয়াস-সাধ্য এবং অতি দুর্ল্লভ। বহু শাস্ত্র পড়িয়া এইরূপ বিশ্বাস জন্মিতে পারে। কেননা এই প্রাচীন দেশে অনেক প্রাচীন মত আছে। কেহ কেহ মনে করেন অনেক প্রকার কঠোর সাধন দ্বারা প্রাণায়াম, সমাধি, অথবা অনেকক্ষণ নিঃশ্বাস অবরোধ করিতে অভ্যাস না করিলে, যোগ-ধ্যানের প্রথম অক্ষর ক, খ ও শিক্ষা করা যায় না।" [কিন্তু এইমত প্রাচীন সংস্কারসম্ভূত] ব্রাহ্মসমাজে যে ধ্যান·········প্রতিষ্ঠিত হইতেছে তাহা সে প্রকার ধ্যান নহে। যেমন নিঃশ্বাস ফেলা, জল খাওয়া স্বাভাবিক, ধ্যান করাও তেমনই স্বাভাবিক। কিন্তু এই কথা বলিবামাত্র সমস্ত হিন্দুস্থান ঠিক যেন ইহার প্রতিবাদ করিল। কিন্তু ব্রাহ্মগণ সাবধান, সেই প্রতিবাদ বিশ্বাস করিও না। কেননা তাহা মিথ্যা প্রতিবাদ। যদি ধ্যান সহজ না হয়, তবে জানিবে তোমাদের ধ্যান হয় না। ধ্যান সম্পর্কে যত অন্ধকারের

ভিতরে প্রবেশ করিবে, তত পথ হারাইবে। যত প্রথমাবস্থায় একটু জ্ঞান থাকে শেষে তাহাও থাকে না, অবশেষে কল্পনা এবং সংসার-চিন্তা আসিবে। ক্ষণে ক্ষণে নিদ্রা যাইবে আর স্বপ্ন দেখিবে এবং নিদ্রা ভঙ্গ হইলে অনুতাপ করিবে। প্রকৃত ধ্যান মনের সহজ অবস্থা ; তুমি আছ এবং আমি আছি, সহজে এই কথা বলিতে পারাই ধ্যানের অবস্থা।...সহজেই ধ্যান হয় একথা বলাতে ইহা বলা হইতেছে না যে, ধ্যানের চেষ্টা একেবারে ছাড়িতে হইবে। ইচ্ছাপূর্ব্বক অনেকবার বাহ্যিক ব্যাপার হইতে মনকে টানিয়া লইতে হইবে। বারম্বার মনকে বলিতে হইবে, অন্য চিন্তা ছাড়, ঈশ্বর-চিন্তা আরম্ভ কর। এরূপ চেষ্টা না করিলে চঞ্চল মন ধ্যানের পথে আসিবে না।

এটী করিও না, ওটী করিও না, এ সমুদয় নিবৃত্তির পথ ; এইটী কর ইহা প্রবৃত্তির পথ। এই প্রবৃত্তির পথে যখন মনের গতি হইবে তখন এক মিনিটে ধ্যান হইবে। * * * মনকে সংযত এবং সুশিক্ষিত করিব সত্য ; কিন্তু হয় বলিব 'হে ব্রহ্ম এই তুমি আছ', নতুবা বলিব প্রকৃত ধ্যান অনেক দূর। 'এই তুমি আছ' যখন একথা বলিব সর্ব্বাঙ্গ পুলকিত হইবে। ধ্যানে কষ্ট নাই, ধ্যানে কষ্ট নাই, ধ্যানে কষ্ট নাই, ধ্যানে কষ্ট নাই, চারিবার এই কথা বলিলাম। যে ধ্যানে কষ্ট আছে তাহা সত্যের ধ্যান নহে, তাহা সত্যের ধ্যান নহে, তাহা সত্যের ধ্যান নহে, তাহা ব্রহ্মরাজ্যের ধ্যান নহে। ঈশ্বর আমাদিগকে যে ধ্যানের কথা শিখাইতেছেন তাহা সরস এবং

সুখপ্রদ। সেই ধ্যান তেমন স্বাভাবিক যেমন স্বাভাবিক এই বাতির আলোক দেখা। অন্য স্থান হইতে মনকে নিবৃত্ত করিয়া আনিতে চেষ্টা করিবে; কিন্তু ধ্যান যেটী সেটী সহজ। ঈশ্বর এত দয়ালু যে, এত উচ্চ ব্যাপার যেটী, সেটী কত সুলভ করিয়া দিয়াছেন।

(ব্রহ্মধ্যান—২২০ পৃঃ)

(৮)

ধ্যান দ্বারা নরনারীর মধ্যে স্বাতন্ত্র্য আসে বা বৃদ্ধি পায় এই অভিযোগের প্রতিবাদ কেশব করিয়াছেন।

তিনি বৃক্ষের দৃষ্টান্ত দিয়া বলিয়াছেন, "বৃক্ষপত্রে, বৃক্ষ-শাখায় স্বতন্ত্রতা আছে; কিন্তু বৃক্ষমূলে স্বতন্ত্রতা নাই। * * * স্বাতন্ত্র্য বৃক্ষের চারিদিকে, কিন্তু মূলে একতা। * * * মূলেতে যদি মিলন না হয়, শাখায় শাখায় কখন মিলন হইতে পারে না। * * * যেখানে তোমার জীবনের মূল সেই স্থান হইতে আমার জীবনও প্রবাহিত হইতেছে। * * * সেই সাধারণ ভূমিতে গমন করিলে নিশ্চয়ই মিলন হইবে। সেই স্থান ছাড়া সমুদয় স্থান আমাদের পক্ষে বিদেশ, বাণিজ্য ব্যবসায়ের স্থান। যদি পরস্পরের মধ্যে যোগস্থাপন করিতে চাও তবে মূলদেশে চল। * * * ধ্যানের সময় পরস্পর হইতে স্বতন্ত্র হইলে যে আমরা চিরকালের জন্য স্বতন্ত্র হইলাম, ইহা সত্য কথা নহে। এক স্থানে যদি সকলে যায় তাহাদের পরস্পরের

মধ্যে নিশ্চয়ই প্রণয় সঞ্চারিত হইবে। যথার্থ ধ্যান, প্রকৃত উপাসনা, অকৃত্রিম সাধন-ভজন, এই সমুদয় কদাপি বিভিন্নতার কারণ নয়। * * * ইহা (ধ্যান) দ্বারা কেবল ব্যক্তিগত উন্নতি হইবে তাহা নয়, কিন্তু ধ্যান দ্বারা অনন্তকালের স্বর্গীয় ভ্রাতৃভাব এবং বন্ধুতা প্রতিষ্ঠিত হইবে। * * * যদি যথার্থ প্রেম-পরিবার স্থাপন করিতে চাও, গভীর ধ্যানে মগ্ন হও, সেখানে দুইজনের মিলন। * * * মনুষ্যজাতির সকল শাখা এক হইবে। যত পরিবার, ঐখানে গিয়া এক পরিবার হইবে। * * * সকল মানুষ একটী মানুষ হইবে।

(ধ্যান এবং প্রেম—২২৩ পৃঃ)

(৯)

[ব্রহ্মের স্বরূপ সাধন দ্বারা আরাধনা করিতে করিতে]

"যখন পুণ্যের ভিতরে সত্য, জ্ঞান, অনন্ত, প্রেম একত্র মিশিল, সমুদয় এক স্বর্গীয় বর্ণে বিলীন হইল, তখন আনন্দের উদয় হইল। * * * গভীর আনন্দের জল সাধককে নিমগ্ন করিল। ভিতরে উপরে নীচে গভীর আনন্দ জল বাড়িতে লাগিল, আর তাহার ভিতরে ডুবিয়া গেল। যখন ভিতরে আনন্দ বাড়িতে লাগিল তখন আরাধনা শেষ হইল। এখন একাকী নিমগ্ন হইবার সময় উপস্থিত। এখন আরাধনার রাজ্য হইতে ধ্যানের রাজ্যে প্রবেশ করিতে হইবে। যেমন কোন একটী বাড়ীর এক এক অংশ দর্শন করিয়া পরে সমগ্র বাড়ী দেখা হয়, যেমন

কোন একটী লোকের একটী একটী গুণ নিরীক্ষণ করিয়া পরে সমষ্টিতে তাহাকে দর্শন করা হয়, যেমন কোন একটী বৃক্ষের শাখা পল্লবাদি দেখিয়া পরে সমগ্র গাছটী প্রত্যক্ষ করা হয়, * * * তেমনই আরাধনায় এক একটী স্বরূপ বিদ্ধ করিয়া তারপর ধ্যানের সময়। * * * তখন ভিন্ন ভিন্ন ছিল, এখন মিলন। এখন সমুদয় স্বরূপগুলিকে এক করিতে হইবে। আরাধনার সময়ে ভিন্ন ভিন্ন স্বরূপের এক একটী করিয়া বিদ্ধ করা হইয়াছে, এখন আর তাহা চলিল না। ধ্যান কি? এখন আর হাত পা চক্ষু কর্ণ এরূপ স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র আমি দেখিব না; অর্থাৎ এক মার রূপ একটী ব্যক্তিরূপে হৃদয়ের ভিতরে অবলোকন করিব। একটি মন্ত্রে ঈশ্বর ধারণ ধ্যান। ধ্যান একত্র সমুদয় গুণের সমষ্টি। একটি মাত্র আধার যাহাতে চক্ষু মুখ সকলই আছে। মা কি, ধ্যান তাহা বলে না, কেবল বলে মা। মার কি কি গুণ আরাধনায় বর্ণনা করিব, ধ্যানে কেবল মাকে দেখিব। মার কোন্ কোন্ গুণ ভাবিব, অর্চ্চনা করিব, আরাধনায় তাহা ঠিক করিব। মার কাছে বসিয়া মা মা মা ভাবিতে ভাবিতে কেমন আনন্দসাগরে ডুবিয়া যাই, ধ্যান আমাদিগকে ইহা বলে।

আরাধনায় স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র স্বরূপ চিন্তন, ধ্যানে একত্র দর্শন। আরাধনার পাত্র তিনি, যিনি এক, যিনি অমৃত, যিনি প্রেম, যিনি পুণ্য, যিনি জ্ঞান, যিনি সত্য, যিনি অনন্ত, যিনি আনন্দ। ধ্যানের পাত্র তিনি, যিনি এ সকলের আধার।

আমাদিগকে প্রস্তুত করে, ধ্যান আমাদিগকে সম্পন্ন করে। আরাধনায় আমরা যে যে স্বরূপ বলি, ধ্যানে সে সমস্ত একাধারে দর্শন করিয়া মোহিত হই। আরাধনা, মার চক্ষু মনোহর, মুখ উৎকৃষ্ট, কথা সুমিষ্ট, এইরূপে তাঁহার গুণের কথা বলিল, ধ্যান আর কোন কথা না বলিয়া কেবল বলিল মা, এই মা, ইনি মা, এখানে মা। ওমা বলিয়া সম্বোধন, ইহা ভিন্ন আর কিছুই নাই।

এই স্থানে এই সময়ে মা বলিতে বলিতে নেশা উপস্থিত, ক্রমে নেশা ঘনীভূত হইয়া বাক্যরোধ। আনন্দ যখন অল্প তখন কথা থাকে, যখন আনন্দ উথলিয়া উঠে, খুব মত্ততা জন্মে, তখন বাক্য বন্ধ হইয়া অবাক ধ্যান উপস্থিত হয়, মৌনাবলম্বন উপস্থিত হয়। তখন সাধক মুনি হইয়া একেবারে ব্রহ্মসাগরে ডুবিলেন। যত আস্বাদন করিতে লাগিলেন তত আরও ডুবিতে লাগিলেন। ভ্রমর যখন প্রথম মধুর অন্বেষণ করে, তখন ক্রমান্বয়ে গুন্ গুন্ করিতে থাকে, যাই পুষ্প পাইল, তাহার চারিদিকে গুন্ গুন্ করিয়া ঘুরিতে লাগিল, ভিতরে যখন প্রবেশ করিল, তখন গুন্ গুন্ শব্দ করিয়া প্রবেশ করিল, যাই মধু পান করিতে লাগিল আর তাহার শব্দ নাই। মুনি যখন ধ্যানে ব্রহ্মে প্রবিষ্ট হইলেন, তখন আর তাঁহার কোন শব্দ নাই ; কিন্তু যখন তিনি আরাধনা করিতেছিলেন, স্বরূপ সকল নিরূপণ করিতেছিলেন, তখন তাঁহার শব্দ ছিল। ধ্যানে প্রবিষ্ট হইয়া যখন মধুপান করিতে প্রবৃত্ত হইলেন তখন

সকল শব্দের নিবৃত্তি হইল।······বিশেষ অবস্থা ধ্যানের অবস্থা কেননা ইহাতে আদর্শ বোধগম্য হয়। আরাধনায় তাঁহার ভক্তবৎসলতা, দীনবৎসলতা বিবৃত হইয়াছে। ধ্যানের সময় হৃদয়নাথ হৃদয়ে প্রকাশিত।······যদি সুখী হইতে চাও, প্রকৃত উপাসনা ভিন্ন আর দ্বিতীয় উপায় নাই। এ সংসারে কেবল এক হরিনামানন্দে সকলে পুলকিত ও মত্ত হয়। (সেবকের নিবেদন, ৪র্থ খণ্ড, ৪র্থ সংস্করণ, ১২৯ পৃঃ, ব্রহ্মোপাসনা)

(১০)

"ধ্যানের সময় মনে করিতে হইবে যেন কাছে কেহই নাই, যেন একাকী বসিয়া আছি, ধ্যানের অবস্থায় গভীর জনতার মধ্যেও এই নির্জ্জনতা উপলব্ধি করিতে হইবে। তখন কেহ কাহার নহে ইহা প্রতীতি করিতে হইবে। গণনা হইতে স্ত্রী পুত্র, বিশেষতঃ ধর্ম্মপক্ষের সহায়দিগকেও পরিত্যাগ করিতে হইবে। ধ্যানের সময় ধন, মান, স্ত্রী, পুত্র, অবশেষে ব্রাহ্ম-বন্ধুও চলিয়া গেল। আপনার শরীরও গেল। কেবল আত্মা পরমাত্মাকে অবলম্বন করিয়া রহিল। ধ্যানের সময় আর কাহাকেও দর্শন করিতে স্পৃহা থাকে না! তখন ঈশ্বরের সত্তা ভিন্ন আর যত সত্তা সমুদয় বিলুপ্ত হয়। কিন্তু······কেবল ধ্যান কি পৃথিবীর শেষ অবস্থা? তাহা নহে। ধ্যানের সময় আপাততঃ শাখা হইতে মূলে গমন করি। মূলে সকলই এক।

ধ্যানপথে কাহাকেও দেখিতে পাওয়া যায় না। না বন্ধু, না শত্রু, না যুবা, না বৃদ্ধ কাহাকেও দেখা যায় না। একাকী চলিয়া যাইতে হয়। একাকী······ক্রমাগত যাও।······ ইহা নিশ্চয় জানিও যেখানে তুমি যাইতেছ আমিও সেইখানে যাইতেছি। ক্রমাগত শাখা ভুলিয়া গিয়া মূলের দিকে যাইতেছি।—সেখানে যখন গেলাম, তখন সকলেই একীভূত এবং মূলীভূত হইলাম। স্বতন্ত্রতা, বিবাদ বিসম্বাদ চলিয়া গেল।

* * * *

অনেকে বলিতে পারেন সভার দ্বারা অপ্রণয় যায় এবং ধ্যান দ্বারা কেবল স্বতন্ত্রতা বৃদ্ধি হয়, কেননা ধ্যানের সময় কাহারও সঙ্গে পথে দেখা হয় না। আমি এই কথার প্রতিবাদ করি। আমি বলি মূলেতে যদি মিলন না হয়, শাখায় শাখায় কখন মিলন হইতে পারে না।

('ধ্যান এবং প্রেম' হইতে উদ্ধৃত)

(১১)

[ধ্যানের ঘরে যাইবার সময়]

"সব মায়া কাট—কেবল ব্রহ্মমায়া থাকুক।"

"যোগের স্থান, ধ্যানের স্থান অতি পবিত্র।" "সেখানে ব্রহ্মদর্শন ব্রহ্মকথা শ্রবণ কেবল তাঁহার (যোগীর) কার্য্য হয়।" এখান হইতে মনে করিলে স্বর্গের সংবাদ আনিতে পারা যায়।

(দৈনিক উপাসনা, ১ম ভাগ, ১ম-সংস্করণ, ৬৯ পৃঃ)

(১২)

'বিশ্বাস, ধ্যান এবং দর্শন, ইহাদের পরস্পরের সহিত সম্বন্ধ' কেশবচন্দ্র এইরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন ঃ—

এই তিনটী আধ্যাত্মিক সাধনের সাধারণ ভূমি। ইহারা মূলে এক, কেবল ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে। যে কোন সত্য হউক, জ্ঞান দ্বারা দৃঢ়রূপে বন্ধন করিয়া প্রত্যক্ষ করার নাম বিশ্বাস, অধিককাল একাগ্রচিত্ত হইয়া ঈশ্বরের সহবাস অনুভবের নাম ধ্যান, ইহা কেবল ঈশ্বর সম্বন্ধে প্রয়োগ হয়। ঈশ্বরকে উজ্জ্বল ও অব্যবহিত রূপে প্রত্যক্ষ করার নাম দর্শন। দর্শন ধ্যানের সাময়িক ভাব। ধ্যান অর্থ—হৃদয়ে ঈশ্বরকে ক্রমাগত ধারণ করা, অবিশ্রান্ত চিন্তা দ্বারা তাঁহাকে আয়ত্ত করিয়া রাখা। যখন স্থিরচিত্ত হইয়া যতক্ষণ ইচ্ছা ঈশ্বরকে হৃদয়ে ধারণ করা যায়, সেই উচ্চ ধ্যান ; নিকৃষ্ট ধ্যান কেবল ধারণের চেষ্টা। কেবল বুদ্ধি ও চিন্তা দ্বারা বহুকষ্টে ধ্যান—বিকৃত ধ্যান, প্রকৃত ধ্যান স্বাভাবিক উজ্জ্বল দর্শন। ঈশ্বরধ্যানে তদ্গত ও নিমগ্ন হওয়া চাই। ভক্তি-যোগে ধ্যান উৎকৃষ্ট, জ্ঞান-যোগে, নিকৃষ্ট। জ্ঞান ও ভক্তি স্বাভাবিক অবস্থাতে এক। পিতামাতাকে জানিবার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদের প্রতি ভক্তি প্রবাহিত হয়। বিশ্বাস, ধ্যান ও দর্শন পরস্পর গাঢ়যোগে সম্বদ্ধ। যেখানে বিশ্বাস ও দর্শন শুষ্ক, সেখানে ধ্যানও শুষ্ক। যেখানে বিশ্বাস ও দর্শন সরস, সেখানে ধ্যানও শান্তিপ্রদ।

* * * *

জীবনকে ভাল করা চাই এবং ঈশ্বরের স্বভাব দ্বারা আপনার স্বভাবকে বিশুদ্ধ করা আবশ্যক। তাহা হইলেই উপাসনা সার্থক হয়, এবং বিশ্বাস ধ্যান দর্শন, চিন্তা বা কল্পনার বিষয় না হইয়া, দিন দিন জীবনের অন্নপান হয়।

(সঙ্গত, ১ম সং, ৪৩ পৃঃ)

৬

উপাধ্যায় গৌরগোবিন্দের বিবৃতি।

মহামনীষী যোগব্রত উপাধ্যায় গৌরগোবিন্দ রায়ের 'ধর্ম্মতত্ত্ব' নামক গ্রন্থ হইতে বিবেক ও বুদ্ধির কথোপকথন ছলে তাঁহার ধ্যান সম্বন্ধীয় বিবৃতি নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম। ইহা সবিশেষ শিক্ষাপ্রদ।

বুদ্ধি। আরাধনার পর ধ্যান উপস্থিত। প্রথমে একবার উদ্বোধন হইয়াছিল। আরাধনার পর আবার ধ্যানের উদ্বোধন করা হয় কেন? উহাতে কি আরাধনায় যে সাক্ষাৎকার হইয়াছে তাহা উদ্বোধন দ্বারা বিচ্ছিন্ন হইয়া যায় না?

বিবেক। আরাধনার পর কোন উদ্বোধন না করিয়া একেবারে নিস্তব্ধ হইয়া যাওয়াই স্বাভাবিক। যেখানে বহুবিধ লোক সমবেত হয়, সেখানে ধ্যান কি, ইহা বুঝাইয়া দেওয়া প্রয়োজন হয়। এই প্রয়োজন মনে করিয়াই ধ্যানের উদ্বোধন

পূর্ব্ব হইতে প্রচলিত আছে। যেখানে এরূপ প্রয়োজন আছে, সেখানে দীর্ঘ উদ্বোধন না করিয়া দু'চারি কথায় করিলে আরাধনার সাক্ষাৎ সম্বন্ধ কাটে না। এরূপ উদ্বোধনই ভাল।

বুদ্ধি। আরাধনা ও ধ্যানের পরস্পর সম্বন্ধ কি?

বিবেক। আরাধনা ও ধ্যানের সম্বন্ধ অতি ঘনিষ্ঠ। বস্তু প্রত্যক্ষ না হইলে কখন পূর্ণমাত্রায় তাহার সম্ভোগ হয় না। সত্য বটে, বস্তু প্রত্যক্ষ করিতে গিয়া তাহার সঙ্গে সঙ্গে সম্ভোগও হয়, কিন্তু পূর্ণমাত্রায় সম্ভোগে এই একটী ব্যাঘাত আছে যে, তখন বস্তু নির্ব্বাচিত হইতেছে, তন্মধ্যে কি কি ভাব সন্নিবিষ্ট আছে, তাহা বুদ্ধিগোচর করা হইতেছে। এরূপ করিতে গেলে ভাব হইতে ভাবান্তরে দ্রুত বেগে প্রবেশ ঘটে, সুতরাং সম্ভোগের মাত্রা তত অধিক হয় না। আরাধনায় ইহাই ঘটিয়া থাকে। বস্তুর স্বরূপ প্রত্যক্ষ করিকে গিয়া স্বরূপ হইতে স্বরূপান্তরে গমন এবং সেই একই স্বরূপমধ্যে কি কি ভাব ও সম্বন্ধ আছে তাহার পর্য্যালোচনায় সম্ভোগের মাত্রা বড়ই অল্প হইয়া পড়ে। আরাধনা সেখানে শেষ হইল যেখানে সমগ্রস্বরূপ এক অখণ্ডবস্তু হইয়া প্রকাশিত। আনন্দস্বরূপে এই অখণ্ডত্ব সিদ্ধ হইয়াছে। কেবল অখণ্ডত্ব সিদ্ধ হইয়াছে তাহা নহে, সমুদায় জীব অখণ্ড হইয়া এক মহাজীবে পরিণত হইয়াছে। অখণ্ড আনন্দঘন ব্রহ্ম ও অখণ্ড জীবের যোগ আনন্দে যখন সিদ্ধ হইল, তখন সেই অখণ্ড জীব অখণ্ড আনন্দসম্ভোগে প্রবৃত্ত। এই যে অখণ্ড জীবের

অখণ্ড আনন্দসম্ভোগ ইহাই ধ্যান। এস্থলে ধ্যানশব্দ প্রয়োগ যদিও ঠিক নয়, সমাধিশব্দ প্রয়োগ কথঞ্চিৎ ঠিক, তথাপি সম্ভোগে যখন জীবের চৈতন্য বিলুপ্ত হয় না, আমি সম্ভোগ করিতেছি এরূপ জ্ঞান থাকে, তখন সমাধিশব্দ প্রয়োগ না করিয়া ধ্যানশব্দের প্রয়োগ মন্দ নয়। তবে সাধারণতঃ ধ্যান বলিতে চিন্তা বুঝায়। এখানে চিন্তা নাই চৈতন্য আছে। এ প্রভেদ মনে রাখা প্রয়োজন। একে যদি ধ্যান বলিতে না চাও, যোগ বল।

বুদ্ধি। চিন্তা নাই চৈতন্য আছে, এ প্রভেদ ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিলে ভাল হয়।

বিবেক। কোন একটী বস্তুর সকল দিক্ ভাল করিয়া নির্ব্বাচন করিতে গিয়া আমরা চিন্তা নিয়োগ করিয়া থাকি। চিন্তা এইজন্য প্রবাহক্রমে ধাবিত হয়। হইতে পারে, একই বিষয়েতে চিন্তানিয়োগ করাতে বিসদৃশপ্রবাহ না হইয়া সদৃশ প্রবাহ হয়, কিন্তু আরাধনার পর যে ধ্যান উপস্থিত, তাহাতে সদৃশ চিন্তাপ্রবাহও উপযোগী নয়। বস্তুর সমগ্র দিক্ দেখা যখন আরাধনাতে নিষ্পন্ন হইয়াছে, এবং অখণ্ড পরমপুরুষ অখণ্ড জীব সন্নিধানে উপস্থিত, তখন কেবল তাঁহাতে মনোভিনিবেশ করিয়া আনন্দসম্ভোগ ইহাই স্বাভাবিক। জীব-চৈতন্যের অস্তিত্ব বিনা সম্ভোগ কখন সম্ভব নয়, এজন্য অদ্বৈত-বাদিগণের ন্যায় জীবচৈতন্য পর্য্যন্তকে বিলুপ্ত করা কখন সমুচিত নয়। জীবচৈতন্যকে বিলুপ্ত করিলে মূর্চ্ছিতাবস্থা

উপস্থিত হয়, ধ্যেয় ধ্যাতার জ্ঞান বিলুপ্ত হয়। ইহাকে আনন্দ-জনিত মূর্চ্ছা বলে। মূর্চ্ছাবস্থার অপগম হইলে তবে মনে হয় কি সুখেই ছিলাম। আমি যে ধ্যানের কথা বলিতেছি, এ ধ্যান মূর্চ্ছা নহে, সম্ভোগ। এখানে আনন্দসম্ভোগ ভিন্ন আর কিছু নাই, এজন্য মনে আর বিষয়ান্তরের প্রবেশ হয় না বলিয়া চিন্তাপ্রবাহ অবরুদ্ধ থাকে।

বুদ্ধি। বিষয়ান্তরের প্রবেশ না হইলেও স্বরূপ সমুদায়ের ক্রমিক স্ফূর্ত্তি মনে হইলে তো তদ্বিষয়ক চিন্তা ধ্যানে থাকিতে পারে। তুমি এ চিন্তা যদি বারণ কর, তাহা হইলে সম্ভোগ-কালে জ্ঞানাদি আত্মার উপকরণ হইয়া তাহাকে বর্দ্ধিত করিবে কিরূপে? আত্মার ক্ষুন্নিবৃত্তি, তুষ্টি, পুষ্টিই বা সিদ্ধ হইবে কিরূপে?

বিবেক। দেখ বুদ্ধি, তুমি এখন অরূপ ব্রহ্মের রূপরস-পান করিতেছি। তুমি চৈতন্য, ব্রহ্মও চৈতন্য। চৈতন্য চৈতন্যকে সম্ভোগ করিতেছে। এই সম্ভোগই রূপরসপান। এ চৈতন্য তোমার নিকট মিষ্ট হইতেও মিষ্টতর, সুগন্ধ হইতেও সুগন্ধতর, কেন না ইহা প্রেম-পুণ্য-মাখা। রসস্বরূপের রস-সম্ভোগ ইহার অর্থ—প্রেমপুণ্য চৈতন্যে মিশিয়া গিয়া যে আনন্দমূর্ত্তি প্রকাশ পাইয়াছে তাহাতে মুগ্ধ হইয়া স্থিতি; স্বরূপরূপ রূপের দ্বারা মনোহর পরমপুরুষে মগ্ন হইয়া থাকা। এইরূপ স্থিতিতেই এখানে কৃতার্থতা। জ্ঞানাদির আত্মাতে প্রবেশ সাধনের জন্য চিন্তার প্রয়োজন নাই, অখণ্ড আনন্দ-

মূর্ত্তির অন্তঃপ্রবেশে উহা স্বতঃই সিদ্ধ হইতেছে। তুমি যখন কোন ব্যক্তির প্রেমাদির পরিচয় পাইয়া তাঁহাতে মুগ্ধ হইয়াছ, তাঁহাকে দেখিবামাত্র তোমার এমনই ভাবোদয় হয় যে, আর তাঁহার গুণের আলোচনা করিতে প্রবৃত্তি হয় না, তাঁহাকে দেখিতে দেখিতে সমগ্র তিনি তোমাতে অন্তর্নিবিষ্ট হন, আর তুমি তিনি হইয়া যাও। একজন আর একজন হইয়া যায়, এ ব্যাপারটী বুঝিবার সময় এখন তোমার উপস্থিত। আশা করি, তুমি উহা উপলব্ধি করিয়া সেই সঙ্গে পরম-পুরুষের রসমূর্ত্তিতে এক হইয়া যাইবে। তোমার নবীন অবস্থা, জানিও, এই মহত্তম ব্যাপার সাধনের জন্য।

বুদ্ধি। তুমি এ কি বলিলে? যে ব্যক্তিতে মুগ্ধ হইয়া আমি তাঁহার সঙ্গে এক হইলাম, তিনিই তো পরমপুরুষের রসমূর্ত্তিতে মগ্ন হইবার অন্তরায় হইবেন।

বিবেক। অখণ্ড জীব ও অখণ্ড ব্রহ্মের কথা যাহা পূর্ব্বে বলিয়াছি সেইটি ভাল করিয়া ধারণ করিতে না পারাতে তোমাতে এ ভ্রম উপস্থিত। তুমি যাঁহাতে মুগ্ধ তাঁহার সহিত যখন এক হইয়া গিয়াছ, তখন আর দুজন কোথায় রহিলে, রহিল তো একজন। এখানে জীব সম্বন্ধে দ্বৈতভাব অন্তরিত হইয়াছে। দুই নয় এক জীবব্রহ্মের রসমূর্ত্তি সম্ভোগে প্রবৃত্ত। একজনের সঙ্গে এক হইতে পারিলে সহস্র জনের সঙ্গে এক হওয়া সম্ভব হয়। আনন্দস্বরূপমধ্যে সাধু ঋষি মহর্ষি আত্মীয় স্বজন বন্ধু প্রভৃতি তাঁহাতে মগ্ন হইয়া, অভিন্ন হইয়া রহিয়াছেন।

তুমি যখন আনন্দে মগ্ন হইলে তখন তুমিও তাঁহাদের সহিত অভিন্ন হইয়া গেলে। সকলে মিলিয়া যে এক অখণ্ড জীব হইল, সে জীব তোমার আত্মচৈতন্য সহ একীভূত। সকলের সঙ্গে এক হইয়া তোমার সম্ভোগে সামর্থ্য বাড়িল। তুমি ক্রমান্বয়ে পরমপুরুষের রসমূর্ত্তিতে ডুবিতে লাগিলে। এই ডোবাই নববিধ ধ্যান বা যোগ। এখানে অন্তর বাহির এক হইয়া গিয়াছে, চিদানন্দরসসাগর উর্দ্ধে, অধোতে, দক্ষিণে, বামে। এই ব্রহ্মরসের অন্তঃপ্রবেশে আত্মা জ্ঞান, প্রেম, পুণ্যে তুষ্ট, পুষ্ট, পরিতৃপ্ত।

বুদ্ধি। বিবেক, তোমার একটী কথায় আমার সন্দেহ হইয়াছে। আমরা এক এক জন এক একটী জীব; সকলেই স্বতন্ত্র। পূর্ব্বে যখন অখণ্ডত্ব ছিল না, তখন অখণ্ডত্ব মনে করা কি কল্পনা নয়?

বিবেক। অখণ্ডত্ব নাই, আমরা পরস্পর হইতে একান্ত স্বতন্ত্র, ইহাই কল্পনা। কোন একটী বস্তু অপর বস্তু সকল হইতে স্বতন্ত্র হইয়া যেমন থাকিতে পারে না, উহারা পরস্পর ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে আবদ্ধ, তেমনি এক আত্মা অপর সকল আত্মার সম্বন্ধ নিরপেক্ষ হইয়া থাকিতে পারে না। নিরপেক্ষ বা একান্ত স্বতন্ত্র বলিয়া যে মনে হয়, উহা অজ্ঞানতামূলক। ধ্যান-যোগে এই অজ্ঞানতা অন্তরিত হইয়া প্রকৃত তত্ত্ব প্রকাশ পায়। বুদ্ধি, তুমি নির্জ্জনে বসিয়া অদ্যকার কথাগুলি ভাল করিয়া বিচার কর, আয়ত্ত কর, এবং তোমার জীবনের নবীন অবস্থা

কিরূপে ব্রহ্মযোগে পরিণত হইতে পারে, তাহার উপায় উদ্ভাবন কর।

৫

শ্রীযুক্ত পণ্ডিত সীতানাথ তত্ত্বভূষণের বিবৃতি।

(ক)

[আমরা যে চিন্তা ও বিচার দ্বারা ব্রহ্মের সত্যতা, জ্ঞান ও প্রেম জানিতে চেষ্টা করি] ইহা জ্ঞানের অপরিহার্য্য অবশ্যম্ভাবী সাধন, ঋষিদের মতে ইহা জ্ঞান-সাধনের প্রথম সোপান মাত্র। তাঁহাদের ভাষায় ইহা মনন, বুঝিবার চেষ্টা। ইহার উপরে নিদিধ্যাসন, বিশেষরূপে ধ্যান করা, ধ্যান দ্বারা বস্তুকে ধরিবার চেষ্টা। এই চেষ্টা ও চেষ্টার ফলকে পরবর্ত্তী সময়ে ধারণা, ধ্যান ও সমাধি, এই তিন ভাবে বিভক্ত করা হইয়াছিল। ব্রহ্মকে আত্মা ও বিশ্বরূপে সাক্ষাৎভাবে,—'এই সেই', এই ভাবে,—ধরার নাম 'ধারণা'। ধারণা শিথিল হইয়া গেলে তাহাকে দৃঢ় করিবার চেষ্টার নাম 'ধ্যান'। এই চেষ্টার ফলে যখন দর্শন বা উপলব্ধি এমন উজ্জ্বল ও গাঢ় হইয়া যায় যে ধ্যেয় ও ধ্যাতার মধ্যে আর কোন ব্যবধান থাকে না, তাঁহারা অবিচ্ছেদ্য হইয়া যান, তখনই তাহাকে বলে 'সমাধি'। সমাধি পূর্ণ আনন্দ ও পবিত্রতার

ধারণা, ধ্যান ও সমাধি

অবস্থা। ইহা মুক্তির পূর্ব্বাভাস। ইহা জীবনে স্থায়ী হইলে ইহাকে বলে 'জীবন্মুক্তি'।

(শাস্ত্রীয় ব্রহ্মবাদ ও ব্রহ্মসাধন—৮১ পৃঃ)

(খ)

গীতাকার ধ্যানযোগের উপদেশ দিয়া তাঁহার প্রথম ষট্‌ক শেষ করিয়াছেন। ধ্যানযোগ কর্ম্মের অন্তর্গত নহে, জ্ঞানের অন্তর্গত। ধ্যানে ব্রহ্মানুভূতি হইলে কর্ম্মযোগ সুগম হয় এবং কর্ম্মযোগে ধ্যানসাধনের সহায়তা হয়, সম্ভবতঃ এইজন্যই কর্ম্মষট্‌কের শেষভাগে ধ্যান উপদিষ্ট হইয়াছে।

ধ্যানযোগ

(ঐ—১২০ পৃঃ)

(গ)

এখন আমরা গীতার অভ্যাস বা ধ্যানযোগের কথা সংক্ষেপে বলিব। পাঠক দেখিবেন যে গীতাকার ধ্যানযোগের যে বর্ণনা দিয়াছেন, তাহাতে পতঞ্জলির অষ্ট যোগাঙ্গের মধ্যে কেবল প্রাণায়াম ছাড়া অন্য সমস্ত অঙ্গই—'বহিরঙ্গ' ও 'অন্তরঙ্গ' উভয়ই—আছে। প্রাণায়ামের কথা গীতাকার ৪।২৯ ও অন্যান্য স্থানে বলিয়াছেন। যম-নিয়মের সার কথা চিত্তকে পবিত্র রাখা, ইন্দ্রিয়গুলিকে বুদ্ধির বশবর্ত্তী রাখা।……ঈশ্বর কথা ১ম ষট্‌কের নানাস্থানে এবং এই

অধ্যায়ের ও ১—৯ এবং ১৬, ১৭ শ্লোকে বলা হইয়াছে। আসন অর্থাৎ উপযুক্ত বসিবার স্থান এবং শরীরের অবস্থিতি ১০—১৩ শ্লোকে বলা হইয়াছে প্রত্যাহার অর্থাৎ বিষয় হইতে মনকে আকৃষ্ট করিয়া আত্মাতে স্থাপনের শ্লোকে বলা হইয়াছে। এই পাঁচটী হইল যোগের 'বহিরঙ্গ' ধ্যারণা, ধ্যান ও সমাধি এই 'অন্তরঙ্গ' যোগের কথা ১৯—২৩ এবং ২৭, ২৮ শ্লোকে কথিত হইয়াছে। ২৫ এর শ্লোকে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে,—"আত্মসংস্থং মনঃ কৃত্বা ন কিঞ্চিদপি চিন্তয়েৎ"—"মনকে আত্মসংস্থ করিয়া অর্থাৎ আত্মাতে স্থাপিত করিয়া কিছুই চিন্তা করিবে না।" যাঁহারা ধ্যান ও চিন্তাকে এক মনে করেন এবং জীবাত্মা ও পরমাত্মাকে একান্ত ভিন্ন বস্তু মনে করেন, তাঁহাদের কাছে এই নির্দ্দেশটা অবোধ্য মনে হইবে। মনে হইবে ব্রহ্ম সম্বন্ধে চিন্তা না করিলে আর ধ্যান কি হইল? কিন্তু ব্রহ্মসাধনের শাস্ত্রে 'ধ্যান' চিন্তা নহে। 'ধ্যান' সাক্ষাৎভাবে ব্রহ্মদর্শন। এই ব্রহ্মদর্শনকেই বলা হইয়াছে 'মনকে আত্মসংস্থ করা'। জীবাত্মা ও পরমাত্মার মৌলিক একত্ব সম্বন্ধে পূর্ব্বে অনেক কথা বলা হইয়াছে। জীবাত্মাকে সম্যক্‌ভাবে, স্বরূপে, অনন্তের অন্তর্ভূতরূপে, দেখাই ব্রহ্মদর্শন। এই দেখার অবস্থায় মন চিন্তা করে না, এদিক্ ওদিক্ যায় না, একদৃষ্টিতে ব্রহ্মের দিকে চাহিয়া থাকে এবং

"সুখেন ব্রহ্মসংস্পর্শম্ অত্যন্তং সুখম্ অশ্নুতে"।

—"অনায়াসে ব্রহ্মসংস্পর্শরূপ অত্যন্ত সুখ ভোগ করে।"

জীব-ব্রহ্মের সম্বন্ধ এমন সাক্ষাৎ, অব্যবহিত, যে গীতাকার ব্রহ্মানুভবের সুখকে 'দর্শন' বলিয়া তৃপ্ত হইলেন না,—দর্শনে বস্তু দূরে থাকিতে পারে,—'স্পর্শ' কথাটা ব্যবহার না করিয়া তাঁহার তৃপ্তি হইল না। ধ্যানসাধনে যাঁহারা অভ্যস্ত তাঁহারা এ বিষয়ে গীতাকারের সহিত একমত হইবেন। যাজ্ঞবল্ক্য বরঞ্চ এ বিষয়ে আর এক পদ অগ্রসর। তিনি জীবের সাক্ষাৎ ব্রহ্মোপলব্ধিকে আলিঙ্গন না বলিয়া থাকিতে পারেন নাই। "এবমেবায়ং পুরুষঃ প্রাজ্ঞেনাত্মনা সম্পরিষ্বক্তঃ" * (বৃহ, ৪।৩।২১)। যাহা হউক, বর্ণিত সাধন অভ্যস্ত হইলে আমাদের জ্ঞানগত ও কার্য্যগত জীবনে তাহার কি ফল হয়, তৎসম্বন্ধে গীতাকার তাঁহার ২৯—৩১ শ্লোকে যাহা বলিয়াছেন তাহার মর্ম্ম এই—(১) যোগী সমুদয় বস্তুতে আত্মরূপী ব্রহ্মকে দেখেন এবং আত্মাতে সমুদয় বস্তু দেখেন। (২) এই দেখার ফল এই হয় যে ঈশ্বর কখনও সাধকের অদৃশ্য হন না এবং সাধক কখনও ঈশ্বরের কৃপাদৃষ্টি হারান না। (৩) একত্ব আশ্রয় করিয়া তিনি ঈশ্বরকে সর্ব্বব্যাপীরূপে ভজনা করেন, তিনি যে কোন অবস্থায়ই থাকুন্ না কেন সর্ব্বাবস্থায় তিনি ব্রহ্মেতেই বাস করেন। (৪) সাধক সকলের সুখ দুঃখকে নিজ সুখ ও নিজ দুঃখের মত দেখেন, অর্থাৎ অন্যের সুখে নিজেকে সুখী এবং

* তেমনি এই পুরুষ প্রাজ্ঞ আত্মাকর্ত্তৃক আলিঙ্গিত হইলে (বাহ্য ও অন্তর কিছুই জানিতে পারে না)।

অন্যের দুঃখে দুঃখী বোধ করেন। এরূপ সাধককেই গীতাকার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ যোগী বলিয়াছেন। "স যোগী পরমো মতঃ।"

(ঐ, ১৪২—১৪৪ পৃঃ)।

(ঘ)

ঈশ্বরের সত্তা ও সান্নিধ্য উপলব্ধি—এই অর্থে ব্রাহ্মসমাজে 'ধ্যান' শব্দ ব্যবহৃত হয়। এই উপলব্ধি যদি কেবল পরম্পরাগত বিশ্বাস মূলক বা পরোক্ষ অনুমান-মূলক হয়, তবে তাহাতে ধর্ম্মজীবনে বিশেষ সহায়তা হয় না। ধ্যানের ফল বিশেষ ভাবে লাভ করিতে হইলে ইহা প্রত্যক্ষ জ্ঞানমূলক হওয়া আবশ্যক। ঈশ্বর সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ জ্ঞান লাভ করিতে হইলে বিচার বিশ্লেষণ দ্বারা পরম্পরাগত ভ্রান্ত সংস্কারগুলি দূর করা চাই। এই সকল সংস্কারে আত্মার চক্ষু আচ্ছন্ন করিয়া রাখে, যেমন মেঘরাশি সূর্য্য ও চক্ষুর মধ্যে আসিয়া চক্ষুর পক্ষে সূর্য্যদর্শন অসম্ভব করিয়া দেয়। প্রবল বায়ূচ্ছ্বাসে মেঘরূপ অন্তরায় দূর হইলে চক্ষু সাক্ষাৎভাবে সূর্য্যকে দেখে। জীবও জগতের সঙ্গে ঈশ্বরের সম্বন্ধ বিষয়ে লৌকিক ভ্রান্ত সংস্কারগুলি দূরীভূত হইলে আত্মা প্রত্যক্ষভাবে ঈশ্বরকে দর্শন করে। ব্রহ্মদর্শনই ধ্যান সাধনের উদ্দেশ্য এবং ধ্যানের চরমাবস্থা। কিরূপ বিচার বিশ্লেষণ দ্বারা চলিত সংস্কার দূর করিতে হয়, প্রকৃত ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিতে হয়, তাহা আমার 'ব্রহ্মজিজ্ঞাসা' প্রভৃতি নানা গ্রন্থে বিস্তৃতভাবে বলিয়াছি। প্রত্যক্ষ ব্রহ্মজ্ঞানই ধ্যানের

ভিত্তি, বলিতে গেলে ধ্যানের আরম্ভ বা প্রথমাবস্থা। ইহার শাস্ত্রীয় নাম 'ধারণা'। ইহার দ্বারা প্রকৃত পক্ষেই ব্রহ্মকে ধরিয়া ফেলা যায়, ব্রহ্ম আর অনুমানের বিষয় থাকে না। শাস্ত্রীয় ভাষায় চঞ্চল ধারণাকে স্থির করিবার চেষ্টার নাম 'ধ্যান'। ধ্যানের স্থির অবস্থার নাম 'সমাধি'। ভ্রান্ত সংস্কার দূর হইলে দেখা যায় আমরা প্রত্যেক জ্ঞানক্রিয়ায় একমাত্র ব্রহ্মকেই জানি। তখন রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ, স্পর্শ ব্রহ্মের অন্তর্ভূত হইয়া যায়। ব্রহ্ম চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্, সর্ব্বেন্দ্রিয়ের গোচর হন্। যে আত্মবোধ সমুদায় বোধের মূল, তাহাও ব্রহ্মবোধের সহিত এক হইয়া যায়, জীবাত্মাকে আর পরমাত্মা হইতে স্বতন্ত্র বলিয়া বোধ হয় না। কিন্তু এই অভেদভাবের মধ্যেও ইহার অবিরোধী একটী সূক্ষ্ম ভেদ থাকে। ধ্যেয় ও ধ্যাতা দ্বৈতাদ্বৈত বা ভেদাভেদ সম্বন্ধে সম্বন্ধ বলিয়া অনুভূত হন। এই সূক্ষ্ম ভেদ ধরিতে না পারিলে মনে হয় ব্রহ্ম সম্পূর্ণরূপে নির্ব্বিশেষ বস্তু। ফলতঃ এক, অদ্বিতীয়, অখণ্ড, অনন্ত ব্রহ্মের ভিতরে দেশকাল, রূপ-রসাদি, এবং খণ্ড চৈতন্যরূপী জীবের বিচিত্রতা অব্যাহত, অবিলুপ্ত থাকে। ব্রহ্মের প্রেম এবং নিত্য প্রেমলীলা উপলব্ধি করিলে এই ভেদাভেদ ভাব আরো উজ্জ্বল হয়। যাহা হউক, ধ্যানযোগে ব্রহ্মদর্শনের যে অনুপমানন্দ, তাহা উপনিষদ্ ও তন্মূলক ভগবদ্গীতাদি গ্রন্থে বহুলরূপে বর্ণিত হইয়াছে। নিজে অসংখ্য বার এই আনন্দ অনুভব করিয়াছি,—কৃতজ্ঞতাসহ তাহা স্বীকার করিতে হয়।

কিন্তু নিজ জীবনে ইহা এত ক্ষণস্থায়ী যে ইহার সম্বন্ধে নিজ অভিজ্ঞতা বলিতে সাহস হয় না। এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে, ধ্যানের শুভমুহূর্ত্তে কার্য্যগত জীবনের একটী উচ্চ আদর্শ প্রকাশিত হয়। জগৎ ও জীবের প্রতি কিরূপ দৃষ্টি করিতে হইবে, জীবের প্রতি কিরূপ ব্যবহার করিতে হইবে, পূর্ণ ব্রহ্মার্পণের সহিত কিরূপে সমুদায় কার্য্য সম্পাদন করিতে হইবে, এরূপ একটী আদর্শ প্রকাশিত হইয়া জীবনকে অল্লাধিক পরিমাণে নিয়মিত করে। এই আদর্শ অনুসরণে অসংখ্যবার অকৃতকার্য্য হইয়া অনুতপ্ত হইতে হয় এবং জীবনের অসারতা বোধ করিতে হয়। এই সংগ্রাম ও সংগ্রামজনিত ব্যাকুল প্রার্থনা আধ্যাত্মিক জীবনকে সজাগ রাখে। যাঁহারা ধ্যানসাধন করেন না তাহাদের জীবন উচ্চ আদর্শের অভাবে মলিন ও নির্জীব হইয়া যায়।

আরাধনা ও প্রার্থনা যতদিন ধ্যানমূলক না হয়, ততদিন ইহাদের প্রকৃতি অল্লাধিক অগভীর ও ব্যাহ্যিক থাকে। ধ্যানমূলক হইলে ইহাদের প্রকৃতি বদলাইয়া যায়। তখন শুষ্ক আরাধনা ও ব্যাকুলতাশূন্য নিস্ফল প্রার্থনা ক্রমশঃই অসম্ভব হইয়া যায়। আরাধনা ও প্রার্থনার মধ্যে যদি চিত্ত বিক্ষিপ্ত হয়, সম্মসত্তার বোধ টলিয়া যায় তবে উপাসকের মনে এমন চিন্তার উদয় হয় এবং তাহার মুখ হইতে এমন বাক্য নিঃসৃত হয় যাহা আরাধনা বা প্রার্থনা নহে। এরূপ চিন্তা ও বাক্যে উপাসনার নির্ম্মলত্ব নষ্ট হইয়া উপাসনা দূষিত হইয়া যায়। এরূপ দূষিত

উপাসনা দ্বারা ব্যক্তিগত ও সামাজিক উভয়বিধ ধর্ম্মজীবনের বিশেষ অনিষ্ট হয়। সাধনের প্রথমাবস্থায় সাক্ষাৎ অনুভূতি-মূলক ধ্যান না থাকিতে পারে। কিন্তু সেই অবস্থায়ও উপাসনার আদ্যোপান্তে ঈশ্বরের সত্তাবোধ,—ঈশ্বর নিকটে আছেন এই স্থির অটল চিন্তা—থাকা আবশ্যক। ইহাতে অন্ততঃ উপাসনার বিশুদ্ধতা ও গাম্ভীর্য্য রক্ষিত হয়, সকল সময়ে ভাবের উদয় ও মগ্নতা না হইতেও পারে। এরূপ উপাসনার দ্বারাও প্রভূত উপকার সাধিত হয়। জ্ঞানের গভীরতা এবং নানা উপায়ে হৃদয়ের ভাবপ্রবণতা বৃদ্ধি পাইলে এই উপাসনাই ক্রমশঃ প্রত্যক্ষ ও সরস উপাসনায় পরিণত হয়।

—(সংগৃহীত)

৬

শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ বেদান্তবাগীশের বিবৃতি :

অন্বয়ী ও ব্যতিরেকী ভেদে ধ্যানের দুই প্রণালী প্রসিদ্ধ আছে। ব্যতিরেকী প্রণালীতে নির্ব্বিষয় ব্রহ্মকে ধরিতে যাইয়া বহিরিন্দ্রিয় ও অন্তরেন্দ্রিয়ের বিষয় মাত্রকেই 'নেতি', 'নেতি', করিয়া দূর করিয়া দিতে হয়। দৃষ্টিরও কোন বিষয় থাকে না, চিন্তারও কোন বিষয় থাকেন না। আত্মাকে নির্ব্বিষয় বিষয়ী ভাবিয়া এরূপ ধ্যানের আদেশ, "আত্মসংস্থং মনঃ কৃত্বা ন কিঞ্চিদপি চিন্তয়েৎ।" জ্ঞানস্বরূপ আত্মা কখনও জ্ঞানের বিষয়

বিহীন হইতে পারে না। আত্মাকে জ্ঞানের বিষয়বিহীন করিয়া তাহাতে মনঃসংযোগ করিতে চেষ্টা শূন্যের পশ্চাদ্ধাবন। যুগাচার্য্য রামমোহন নিদিধ্যাসনের অর্থ করিয়াছেন—ঘটপটাদি বস্তুজাত যে সত্তাকে অবলম্বন করিয়া অবস্থিত তাহাকে ধারণ করিবার চেষ্টা। ঘটপটাদি হইতে বিচ্ছিন্ন করিলে সে সত্তা হয় ছিন্ন সত্তা,—abstraction,—তাহা বাক্যের বিষয় হইতে পারে যেমন শ্বেতবর্ণ শ্বেতবস্তুকে ছাড়িয়া কেবল বাক্যেরই বিষয়, কিন্তু ধারণার বিষয় নহে। এই প্রণালীতে ধ্যানের বিষয় হয় শূন্য। কিন্তু সকল প্রপঞ্চে ব্রহ্মসত্তাব স্ফূর্ত্তি দেখাই অন্বয়ী প্রণালীর ধ্যান। অভ্যাসের দ্বারা প্রপঞ্চে আর প্রপঞ্চ প্রতীতি থাকে না, ব্রহ্মসত্তার প্রতীতি হয়—ইহাকেই যুগাচার্য্য বলিয়াছেন, আত্মসাক্ষাৎকার বা অপরোক্ষানুভূতি। একটী দৃষ্টান্তের দ্বারা এই দুরূহ বিষয় কিঞ্চিৎ বিষদ করিবার চেষ্টা করিব, যদিও অনুভূতি গ্রাহ্য বিষয়ের ভাষায় বর্ণনা অধিকাংশ স্থলেই অফলপ্রসূ হইয়া যায়।

প্রাতঃকালে নিদ্রাভঙ্গ হইতেই সুস্বরলহরী অনুভূত হইতে লাগিল। মনে করিতে লাগিলাম, "পাখী গান করিতেছে।" এই যে "পাখী গান করিতেছে" ইহা আপাততঃ বহির্জ্জগতের ব্যাপার বলিয়াই ধরিয়া লই। কিন্তু অনুভব করিতেছি শব্দ মাত্র, "পাখী গান করিতেছে," ইহা ত মন গড়িয়া লইল, ইহা একটী mental construction. যদি শ্রুতি বন্ধ করিয়া দিই তবে যাহাকে বহির্জ্জগৎ বলিতেছি তাহা ত নিরস্ত হইয়া

যায়। এখন এই পাখীর গানকে একটু বিশ্লেষণ করিয়া দেখি। এই স্বর যখন মিষ্ট লাগিতেছে, তখন সমগ্র মনকে ঐ এক রসের দিকে চালনা করি। একমনে উহাই ধ্যান করি। তখন সকল ইন্দ্রিয় যেন শ্রুতিতে পরিণত হইয়া যাইবে। ঐ শব্দ ছাড়া আর কিছুই অনুভূত হইবে না। ইহা প্রতিদিনের অভিজ্ঞতার কথা। গ্রন্থপাঠে মন অভিনিবিষ্ট, সম্মুখের রাস্তা দিয়া ঢাক ঢোল বাজাইয়া শোভাযাত্রা চলিয়া গেল; কর্ণ-পটহে শব্দ তরঙ্গ আঘাত করে নাই তা নয়, কিন্তু শব্দানুভূতি উৎপন্ন হয় নাই। অনুভূতিই শব্দ, শব্দতরঙ্গ শব্দ নয়। মন যখন খুব অভিনিবিষ্ট হইল ঐ সুস্বরলহরীতে, তখন দেখা গেল উহার অবস্থিতি বাহিরে নয়, শ্রুতিতে। উহা শ্রবণেন্দ্রিয়ের ক্রিয়া মাত্র। গভীর অভিনিবেশে, যাহাকে বলি বহির্জ্জগৎ তাহার স্থানে ইন্দ্রিয়ক্রিয়া অবশিষ্ট থাকে। শব্দ সম্বন্ধে যা, অন্যান্য সকল ইন্দ্রিয় সম্বন্ধেই তাই। যাকে বলি বহির্জ্জগৎ তা রূপ-রসাদি গুণের সমষ্টি এবং এই রূপ-রসাদিও দৃষ্টি-শ্রুতি-আস্বাদন মাত্র। ইহাকেই গীতা বলিয়াছেন, শব্দাদি বিষয়সমূহের ইন্দ্রিয়াগ্নিতে হবন (৪।২৬)। গভীর অভিনিবেশে বা ধ্যানে বিষয় জগৎ ইন্দ্রিয়ক্রিয়ারূপে উপলব্ধ হয়। কিন্তু এই ইন্দ্রিয়ক্রিয়া ত ইন্দ্রিয়ের কার্য্য নয়, মনের কার্য্য। ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া চলুক কিন্তু মন যদি সেখান হইতে উঠিয়া যায় তবে কোন কার্য্যই উৎপন্ন হয় না, পূর্ব্বেই দেখান হইয়াছে। "পাখী গান করিতেছে" ইহা কথা নয়, কিন্তু সম্পূর্ণ বস্তুটী (concrete thing)

—"আমি শুনিতেছি, পাখী গান করিতেছে।" ধ্যানে বিষয় জগৎ ইন্দ্রিয়ক্রিয়ায় পরিণত হয়েছে। এখন দেখিতেছি, আমিকে ছেড়ে, আত্মজ্ঞান ছেড়ে, ইন্দ্রিয়ানুভূতির জগৎ, মননের জগৎ বিলুপ্ত হয়ে যায়। "শুনিতেছি" ছেড়ে "পাখীর গান" অস্তিত্বের কোঠায় আসে না। সুতরাং "পাখী গান করিতেছে" এই বিষয়টাতে যদি তন্ময় হইয়া যাই তবে ইহার তলায় দেখি "আমি শুনিতেছি—পাখীর গান।" পাখীর গান তো ইতিপূর্ব্বেই "শুনিতেছি"র মধ্যে প্রবেশ করেছে, এখন "শুনিতেছি" আমির মধ্যে প্রবেশ করিল। কেননা, 'আমি' ছেড়ে 'শুনিতেছি'র কোন অর্থ নাই। এইরূপে দেখা যায়, ধ্যান যত পরিপক্ক হয়, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য-বিষয়জগৎই হোক্ বা মননগ্রাহ্য অন্তর্জ্জগৎই হোক্ সকলই 'আমি'র প্রকাশ, আত্মার বিকাশ বলিয়া অনুভূত হয়।

এখন যদি আমরা যাকে বলি আমাদের ব্যক্তিগত আত্মা তার স্বরূপধ্যানে নিযুক্ত হই তখন দেখি বিশ্বাত্মাই আমাদের প্রতি জনের আত্মারূপে অনুপ্রকাশিত। আমরা জগদাত্মার মধ্যে আছি বলিয়াই এই জগৎ আমাদের কাছে প্রকাশিত হয়েছে। আমরা তো স্বপ্নজাগ্রৎসুষুপ্তির অধীন, আমরা তো স্মৃতিবিস্মৃতির মধ্য দিয়া চলেছি, কিন্তু যদি সেই চিরজাগ্রত, চিরবিনিদ্র, চিরস্মৃতিশীল ভূমা পরমাত্মা আমাদের আত্মারূপে আমাদিগকে না চালাতেন তবে স্মৃতিবিস্মৃতির মধ্য দিয়া নিদ্রা-জাগরণময় আমাদের এই জীবন কখনো সম্ভব হতো না।

তাঁহাকেই আমাদের আত্মারূপে আমরা দেখি বলিয়া এই জগৎ আমাদের আত্মায় অনুভূত হয়। তিনিই আপনাকে এই রূপ-রসময় জগতে প্রকাশিত রেখেছেন। এ জগৎ তাঁর আবরণ নয়, তাঁর প্রকাশক্ষেত্র। অন্বয়ধ্যান তাহাই প্রকাশ করিয়া দেয়। ধ্যানের পরিপক্কাবস্থায় আত্মা যখন ব্রহ্মে অবস্থিত হয় তখন "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" এই অনুভূতি আসে, কিছু হতেই আত্মাকে পৃথক্ ভাবা যায় না। "আত্মৈবাধস্তাদাত্মোপরিষ্টাদাত্মা পশ্চাদাত্মা পুরস্তাদাত্মা দক্ষিণতঃ আত্মোত্তরতঃ আত্মৈবেদং সর্ব্বমিতি" (ছা ৭।২৫।২॥)—"একাত্মা জানিবে সর্ব্ব অখণ্ড ব্রহ্মাণ্ডময়" এই অনুভূতি আসে। এই ভূমার অনুভূতিই সমাধির অবস্থা। এইখানে পৌঁছিলেই—সকল ব্রহ্মময় ব্রহ্ম এইরূপে সাধনীয় হয়েন" (যুগাচার্য্য বাণী)।

—(সংগৃহীত)

৭

শ্রীযুক্ত ভাই গোপালচন্দ্র গুহের অভিজ্ঞতা।

ধ্যানের কথা লিখিতে গিয়া প্রথমে ব্রহ্মাণ্ড-পুরাণের একটি শ্লোকের কথা মনে জাগিল—

"অদৃশ্যে ভাবনা নাস্তি দৃশ্যমেতদ্বিনশ্যতি।
অবর্ণমীশ্বরং ব্রহ্ম কথং ধ্যায়ন্তি যোগিনঃ॥"

—অদৃশ্য বস্তুর ভাবনা সম্ভব হয় না, দৃশ্য বস্তুও বিনাশশীল, ঈশ্বর অবর্ণ। অতএব যোগিগণ সেই বর্ণহীন পরব্রহ্মকে কিরূপে ধ্যান করেন? এই প্রশ্নের উত্তরে বলা হইল—

"উর্দ্ধপূর্ণমধঃপূর্ণং মধ্যপূর্ণং যদাত্মকম্।
সর্ব্বপূর্ণং স আত্মেতি সমাধিস্থস্য লক্ষণম্॥"

সেই চিৎ-স্বরূপ পরমেশ্বর উর্দ্ধে পরিপূর্ণ, অধোতে পরিপূর্ণ, মধ্যে পরিপূর্ণ, সকলই পূর্ণ করিয়া অবস্থিতি করিতেছেন, ঈশ্বরে চিত্ত সমাধানের ইহাই লক্ষণ জানিবে।

যে প্রণালী অবলম্বন করিয়াই হউক ধ্যানের পক্ষে প্রথমে ঈশ্বরের সত্তা অন্তরে, বাহিরে, চতুর্দ্দিকে ধারণা ও উপলব্ধির প্রয়োজন। তাহার পর সেই সত্তায় চিত্ত সমাধানে ধ্যানের আরম্ভ। ঈশ্বরের বাহ্য কোন রূপ নাই বটে, সেই অর্থে তিনি নিরাকার, কিন্তু পরমবস্তু তিনি, তিনি শূন্য নহেন, তিনি সার সত্য, আত্মার চক্ষে তাঁহাকে দেখিবার, আত্মিকভাবে তাঁহাকে ধারণা করিবার রূপ, গুণ তাঁহার সকলই আছে।

বর্ত্তমানে নব যুগধর্ম্ম বিধানে ঈশ্বরের স্বরূপারাধনা, স্বরূপ সাধনা দ্বারা আমরা কল্পনাবর্জ্জিত, বিশুদ্ধ সত্তা অন্তর্দৃষ্টিতে দর্শন, উপলব্ধি ও ধারণার বিষয় করিয়া থাকি।

পরব্রহ্মের সত্তার প্রকাশ যাঁহার জীবনে যত উজ্জ্বল হয়, গভীর হয়, জমাট হয়, ব্রহ্মধ্যান তাঁহার পক্ষে তত সহজ, স্বাভাবিক হয়, তাঁহার জীবনে তত দীর্ঘস্থায়ী হয়। সাধনের

প্রথম স্তরে ঈশ্বরের সত্তা অতি সামান্যভাবে উপলব্ধির বিষয় হয়, সে অবস্থায় ঈশ্বর সত্তায় মন স্থির অল্পই হয়, অল্প সময়ের জন্যই হয়। দীর্ঘ অভ্যাসে এবং বিশ্বাস-ভক্তি-চক্ষে দর্শনে ঈশ্বরের আবির্ভাব উজ্জ্বল হইতে উজ্জ্বলতর উজ্জ্বলতম হয়, মধুর হইতে সুমধুর হয়, সে অবস্থায় ধ্যান খুব সহজ হয়, সুমিষ্ট হয়, সম্ভোগের বিষয় হয়।

ঈশ্বরের স্বরূপ সাধনা ও ধ্যান সজনে আরম্ভ হইতে পারে, সজনে প্রথম শিক্ষার বিষয় হইতে পারে, কিন্তু ব্যাকুল নির্জ্জন উপাসনা সাধনেই স্বরূপারাধনা গভীর হয়, উজ্জল হইতে উজ্জ্বলতর হয়, মধুর হয়, ব্রহ্মসত্তার ধারণা ও ধ্যানও সেই পরিমাণে গভীর হয়, জমাট হয়, চিত্তাকর্ষণের বিষয় হয় এবং দীর্ঘস্থায়ী হয়। সুস্নিগ্ধ গঙ্গাজলে, সমুদ্রজলে অথবা যে কোন গভীর সুস্নিগ্ধ জলরাশির ভিতর তপ্তশিরা মানুষ ডুবিয়া থাকিতেই ভালবাসে, আরাম বোধ করে, চতুর্দ্দিক হইতে জল-রাশি ধীরে ধীরে তাহার শরীরে প্রবেশ করিয়া তাহার শরীরকে স্নিগ্ধ করে, সতেজ, সবল করে, তেমনই অনন্ত পরব্রহ্মের স্বরূপ সাধনায় ও ধ্যানে ঈশ্বরের অনন্ত স্বরূপে প্রবেশ করিয়া তাঁহাকে উর্দ্ধপূণ, অধঃপূর্ণ, মধ্যপূর্ণ, সর্ব্বপূর্ণ অবস্থায় দর্শন উপলব্ধি করিয়া, ধারণা করিয়া, জীবন কতই ধন্য হয়। এরূপ অনন্তের ধ্যানে নিজ জীবনের অনন্ত প্রসারণ, অনন্ত উন্নতি, ক্রমাগত উর্দ্ধগতি দর্শন ও আরও উপলব্ধির সম্ভাবনা হইলে কি যে কি আনন্দ সম্ভোগ হয়, কি যে কি আশা বিশ্বাসে হৃদয়,

পূর্ণ হয় তাহা প্রকাশ করা যায় না। অনন্তের সাধনায় এরূপ ধ্যান সকলের পক্ষে একটী সাধারণ অবস্থা।

ধ্যানের আর একটী বিশেষ অবস্থার কথাও উল্লেখ করিতে ইচ্ছা হইতেছে। আত্মাতে ঈশ্বরকে পরমাত্মারূপে সাধনা এবং মানব চরিত্রে ঈশ্বরকে পরম চরিত্ররূপে সাধনা ও ধারণা। —পূর্ব্বে যে অন্তরে, বাহিরে অনন্তের ধ্যান ধারণার কথা উল্লেখ হইল, সে ধারণা ও ধ্যান অল্পস্থান ও বহুস্থান দুই লইয়া, অল্পস্থান ও বহুস্থানে অভেদ ধারণা। এটী বহুস্থানপ্রধান ধারণা। আর আত্মাতে পরমাত্মারূপে সাধন, বিশেষতঃ চরিত্রে পরম চরিত্ররূপে সাধন ও সেইভাবে ধ্যান ও ধারণা তুলনায়, ঈশ্বরকে অল্পস্থানে ধ্যান ও ধারণা। আমি আত্মা, তিনি আমারই পরমাত্মা, শ্রেষ্ঠ-আত্মা, তাই আমি তাঁহার যোগে আমার শ্রেষ্ঠ অবস্থা, গৌরবের অবস্থা, পরম অবস্থা লাভ করি। তখন তিনি আমার কত আপনার হন, কত নিকটতম হন, কত মধুময় হন। তেমনই আমার সমস্ত চরিত্রে তাঁহাকে লাভ করিয়া নিজ চরিত্রের পরম অবস্থারূপে, চরিত্রের ভূষণরূপে, শোভা সৌন্দর্য্য রূপে লাভ করিয়া সেই অবস্থায় ধ্যান ধারণা করা অপেক্ষাকৃত অল্পস্থানে ধ্যান ধারণা হয়। কিন্তু এরূপ ধ্যান ধারণা খুবই মধুর হয়, সুন্দর হয়, সৌভাগ্যের বিষয় হয়। এরূপ ধ্যান ধারণা উপলব্ধি যোগেই ঋষিগণ ঈশ্বরকে—

"তদেতৎ প্রেয়ঃ পুত্রাৎ প্রেয়ো বিত্তাৎ
প্রেয়োঽন্যস্মাৎ সর্ব্বস্মাদ্ অন্তরতরং যদয়মাত্মা"

বলিলেন—ভক্তেরা তাঁহাকে চরিত্রের অলঙ্কার, চরিত্রের ভূষণ বলিয়া বর্ণনা করিলেন।

যখন ঈশ্বর সত্তার ধারণা বিশেষ অভ্যাসের বিষয় হয়, তখন কেবল নির্দ্দিষ্ট স্বরূপারাধারণায় নয়, ব্রহ্মনাম, হরিনাম, মা-নাম প্রভৃতি সংক্ষেপ নাম-সাধন যোগে ও ঈশ্বরের বিশেষ উপলব্ধি ও ধ্যান ধারণা সহজ হয়, উজ্জ্বল ও মধুময় হইয়া থাকে। প্রাচীন ভক্তিপথে সুধু নামাদি সাধন দ্বারাই ঈশ্বরের ধ্যান ধারণা সম্ভব হইত। আমাদের নব ধর্ম্ম নব বিধানে ঋষি জীবনের সাধনমূলক স্বরূপ সাধনা ও ভক্তিপথের সাধনমূলক নাম সাধনা দুইই গৃহীত হইয়াছে বলিয়া ধ্যান ধারণার পথে দুইই আমাদের অবলম্বনীয় হইয়াছে। ধ্যানের পথে স্বরূপ সাধনা আমাদের সর্ব্বপ্রথম এবং সর্ব্বপ্রধান অবলম্বনীয় সাধনা। যখন স্বরূপ সাধনা ও তাহার অবলম্বনে ধ্যান ধারণা খুবই অভ্যাসের বিষয় হয়, তখন সহজে নামাদি যোগে ঈশ্বরের সত্তা ধ্যান ধারণা সহজ পথ বলিয়া গণ্য হয়, অল্প সময়ে, অল্প শক্তিতে ও সম্ভব হয়।—তাই শেষ জীবনে অনেকে নামাদির মূল্য খুবই দিয়া থাকেন। —(সংগৃহীত)

৮

শ্রীযুক্ত পণ্ডিত শ্রীনাথ চন্দের অভিজ্ঞতা।

"আগে ধ্যানের সময় আমার মনে হইত, আমি যেন ওতপ্রোতভাবে অসীম ব্রহ্মসত্তাতে বেষ্টিত হইয়া আছি। বড়

বড় পাখী যেমন সময় সময় পাখা না নাড়িয়া অনন্ত বায়ুসাগরে ভাসিতে থাকে আমিও তেমনি সেই মহান্ সত্তাতে নিরবলম্বভাবে ভাসিতেছি এবং আনন্দ হিল্লোলে মুগ্ধ হইয়া যাইতেছি। এই ধ্যানে অনন্তের ভাব প্রধান।

এখন ধ্যানের সময় মনে হয় যে, গভীর হইতে গভীরতর ব্রহ্মসত্তা সাগরে ডুবিয়া যাইতেছি। গভীর জলের মীনের মত অতলস্পর্শ ব্রহ্মসাগরের গভীর হইতে গভীরতম দেশে কেবলই ডুবিয়া যাইতেছি—আর কোন সত্তা নাই, কেবলই 'তুমি আর আমি।' এই ধ্যানে ব্রহ্মে অটলস্থিতি ও নৈকট্য প্রধান ভাব। যা বলিলাম তাতে কি কিছু বোঝা গেল ? ইহা যে বচনাতীত। তাই ঋষি বলেছেন—'ততো বাচো নিবর্ত্তন্তে।'

—(সংগৃহীত)

৯

শ্রীযুক্ত ডাক্তার সুন্দরীমোহন দাসের সাক্ষ্য।

প্রাগৈতিহাসিক যুগে নাকি ধ্যানে বসেছিলেন ধ্রুব। ফলে হরিদর্শন লাভ হয়েছিল। ধ্রুব নিজমুখে সে অবস্থার কথা কিছুই বলেন নাই।

ঐতিহাসিক যুগে ধ্যানে বসেছিলেন ভক্তপ্রবর হরিদাস। বাইশ বাজারের প্রহার সে মুখে যাতনার রেখা অঙ্কিত করে নাই।

ঋষি ঈশা ধ্যানযোগস্থ অবস্থায় মস্তকে ধারণ করেছিলেন কণ্টকমুকুট।

ধ্যানমগ্ন, মহাযোগী অঘোর নাথের কর্ণে প্রবেশ করে নাই দস্যুদের হুহুঙ্কার।

ধ্যানরত বিজয়কৃষ্ণ, নগেন্দ্রনাথ স্থান কাল ভুলে যেতেন।

ধ্যেয়ে সক্তং মনো যস্য ধ্যেয়মেবানুপশ্যতি।
নান্যং পদার্থং জানাতি ধ্যানমেতৎ প্রকীর্ত্তিতং।
(গরুড়, পূর্ব্বখণ্ড, ২৪০।৩০)

ব্রহ্মাত্ম চিন্তা ধ্যানং স্যাৎ ধারণা মনসো ধৃতিঃ।
(গরুড়, পূর্ব্ব, ৪৯।৩৮)

ধ্যানে যার মন মগ্ন হয়েছে সে কেবল ধ্যেয়কেই দেখ্‌তে পায়, আর কিছুই দেখে না, জানে না। ধ্যেয় বস্তুর সঙ্গে এক হয়ে ব্রহ্মাত্ম হয়। মন যখন স্থির হয়ে ধ্যেয়কে ধারণা করে, অন্তর্জগৎ ও বহির্জগৎ হয় ধ্যেয়ময়। আর কাহারো স্বতন্ত্র স্থান থাকে না ইহার মধ্যে। তাঁহারই মধ্যে সব যায় মিশে।

ধ্যানের পর ধারণা, ধারণার পর প্রত্যাহার।

যদা সংহরতে চায়ং
কূর্ম্মোহঙ্গানীব সর্ব্বশঃ।
ইন্দ্রিয়ানীন্দ্রিয়ার্থেভ্য
স্তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা॥ (গীতা, ২।৫৮)

—কচ্ছপ যেমন হাত পা প্রভৃতি ভিতরে গুটিয়ে নেয়, তেমনি সাধকের চক্ষুকর্ণনাসিকা, রূপরসগন্ধ থেকে আপনি ফিরে আসে অন্তরের মধ্যে।

সে অবস্থার কাছে কি যেতে পেরেছি? পার্‌লে কিছু বলা সম্ভব হ'ত। পারিনা বলেই গুরুজনের আদেশে নামকীর্ত্তন করি। নামজপ নামকীর্ত্তনেরই অঙ্গ। অসংযত দেহ সাধনের বাদী। নামজপের গুণে দেহের স্থানবিশেষে যখন মন সংলগ্ন হয়, এক অভূতপূর্ব্ব আনন্দে প্রাণ পরিপূর্ণ হয়। আনন্দময় স্বরূপে চিত্ত মগ্ন হয়। নামকীর্ত্তনে শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন এই তিনটী কাজই চলে। একের ভাবতড়িৎ অপরের প্রাণে সঞ্চারিত হয়। তখন বহির্জগতে দৃষ্টি পড়িলে অনুভব করা যায় এক আনন্দনগরে নগরবাসীরা এক আনন্দময়কে নিয়ে আনন্দে মত্ত। তখন "যাহা যাহা পড়ে নেত্র হয় ইষ্টস্ফূর্ত্তি।" (চৈতন্যচরিতামৃত, মধ্যলীলা, ৮)

ভগবানের এবং ভক্তদের কৃপায় এই সৌভাগ্য যে কখনও হয় তাহা অস্বীকার করা যায় না। তখন প্রেমাবতার গৌরচন্দ্রের কথা মনে পড়ে—

"হরের্নাম, হরের্নাম, হরের্নামৈব কেবলম্।"

ঘরে নাই এক মুষ্টি চাউল, খুলে বসি অন্নসত্র। ভিতরে একবিন্দু রস যদি থাকে, দশদিক থেকে দশজন টেনে চুষে নেয়। তাই ব্যবস্থা ঐ নামজপের ও নামকীর্ত্তনের। নামজপ ও

নামকীর্ত্তন এনে দেয় ধ্যান। যখন ২৮,৮০০ শ্বাসপ্রশ্বাসের সঙ্গে নাম চলে, তখন শয়নে স্বপনে জাগরণে যন্ত্রচালিতের ন্যায় নাম চলে এবং ধ্যানও সহজ হয়ে যায়। তখন রূপরসগন্ধ সাধনের বাদী না হয়ে হয় সাধনোপযোগী। তখন কর্ম্ম আনেনা শুষ্কতা, কারণ কর্ম্ম হয় ফলানুসন্ধানরহিত। তখন কর্ম্মী বলেন ঃ—

"ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদিস্থিতেন
যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি।"

এই অবস্থা যখন হবে, তখনই শক্তি আস্‌বে সব কথা খুলে বল্‌বার। (সংগৃহীত)

১০

শ্রীযুক্ত ভাই প্রিয়নাথ মল্লিকের মত ও অভিজ্ঞতা।

ধ্যান মানে ধারণ। আমি বলি ধরাধরি। ধরা, ধরা পড়া বা ধৃত হওয়াই ধ্যান।

ক্ষুদ্র আমি, একটা ধরিতে গেলে, আর একটা ছাড়িতে হয়। ব্রহ্মকে যাই ধরিতে চাই, আমিকে না ছাড়িলে চলে না।

তাই ব্রহ্মধ্যানের প্রথম সোপান তাঁকে ধরবার, পাবার বা তাঁর কাছে যাবার জন্য তীব্র আকাঙ্ক্ষা। যাই আকাঙ্ক্ষা হ'ল, আমি যেখানে আছি, বা যা নিয়ে আছি, তাকে ছাড়তে হবে।

দেহ পিঞ্জরে আমি আবদ্ধ, যাই উড়তে চাই, খাঁচা ছেড়ে আকাশে উড়তে হবে। যখন পাখী উৰ্দ্ধে উড়্‌ল, ক্রমে ক্রমে আপনাআপনি দেহ, সংসার, ঘরবাড়ী, স্ত্রী-পুত্র, রাজ্য, দেশ সব ছোট মনে হ'ল। ক্রমে সব দূরে গেল, অদৃশ্য হ'ল।

সংসারের সব ভয় বিভীষিকা, ভাবনা চিন্তা যাহা মনকে ভীত, আন্দোলিত বা আলোড়িত করিতে ছিল, সব চলিয়া গেল।

আকাশের পর আকাশ, মেঘের পর মেঘ, তারপর বৃষ্টির পর বৃষ্টি ভোগ করিতে করিতে, ঘন বরফের দেশে গিয়া আত্মা-পাখী জমিয়া গেল।

ধ্যানের সাধন প্রক্রিয়া কতকটা এইরূপ তুলনা করা যায়।

প্রথম মনের চিন্তাও ব্রহ্মদর্শনের আকাঙ্ক্ষায় ধ্যান আরম্ভ হয়। দেহপিঞ্জরে যে মন আবদ্ধ সে মন যদি দেহের বা সংসারের বা অন্য কিছুর চিন্তায় নিবদ্ধ থাকে, ধ্যান হয় না। তাই মনকে ব্রহ্মের সত্তারূপ চিদাকাশের দিকে উড়াইয়া দিতে হয়। সত্তার ঘন আকাশে উড়িতে উড়িতে চিন্তাও নির্ব্বাণ হইয়া যায়। চিন্তার নিবৃত্তি বা নির্ব্বাণ না হইলে প্রকৃত ঘন গভীর ধ্যান হয় না। নিঃসঙ্গ নির্জ্জনতা মধ্যে নিশ্চিন্ত মনে দর্শন ধ্যান। প্রথমতঃ ব্রহ্মের সত্তামাত্র নিরাকার আকাশরূপে চিন্তা করিতে করিতে, আকাশ যেমন মেঘাচ্ছন্ন অনুভূত হয়, তেমনি ব্রহ্ম সত্তাকে ধরিতে হইলে, সেই সত্তাই চিন্ময় ব্যক্তিরূপ

ধারণ করিয়া, হরিরূপ ধারণ করিয়া মনকে হরণ করেন ও হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হন।

তখন ধরাধরি। তাঁকে ধরিতে যেতে তিনিই ধরিয়া ফেলেন আমাকে, হরণ করেন আমার আমিকে। তাই নাম করি হরি তাঁকে।

যখন হৃদয় অধিকার করিয়া তিনি অধিষ্ঠিত হ'ন, তখন শরীর মন রোমাঞ্চিত হয়। তাঁর আবির্ভাবে এমনই আচ্ছন্ন করেন যে তাঁর চিন্ময় মুখের দিকে কেবল চাহিয়া থাকিতেই প্রাণ চায়। শিশু আত্মা মাকে দেখিলে যেমন আনন্দ অনুভব করে, তেম্‌নি ক্রমে উপলব্ধ হয়। নিরাকার মা তখন নিরাকার শিশু আত্মা কোলে তুলিয়া লন, তদ্গত, তন্ময় করিয়া লন।

এই অবস্থা হইতেই যোগে আত্মা নিমগ্ন হয়। চিন্ময়ে চিন্ময়, আত্মায় আত্মা। শিশু-আত্মা মাতৃগর্ভে অনুপ্রবিষ্ট হয়। যোগানন্দে আত্মা বিলীন হয়।

এইরূপ সাধন করিতে করিতে ধ্যান সহজ ও স্বাভাবিক হয়। কষ্ট-কল্পনা, সাধ্য সাধনা আর থাকে না।

(সংগৃহীত)

উপসংহার

১

একটী আধুনিক সত্য ঘটনা।

এখন একটী বহুজনবিদিত সত্যঘটনার উল্লেখ করিতেছি। ৺মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা মহাশয়কে অনেকেই জানেন। তাঁহার পত্নী কখন কখন একাসনে ৩০।৩৫ ঘণ্টা পর্য্যন্ত ধ্যানমগ্ন অবস্থায় থাকিতেন। একবার এই কলিকাতা নগরীতে অবস্থানকালে তিনি পূর্ব্বাহ্নে ৮ ঘটিকার পর ধ্যানস্থ হইয়া রাত্রি ২টা পর্য্যন্ত নিশ্চল, নিষ্পন্দভাবে উপবিষ্ট ছিলেন। সেই সময়ে তাঁহার কোলের শিশুকে অন্যেরা আনিয়া তাঁহার স্তন্যপান করাইয়া লইত, কিন্তু তাহাতে তাঁহার ধ্যান ভঙ্গ হয় নাই। এই দৃশ্য একজন ভক্তিভাজন আচার্য্য স্বচক্ষে দেখিয়াছিলেন, তিনি এখনও জীবিত আছেন।

২

জনৈক বৃদ্ধের সাক্ষ্য।

পরিশেষে, একজন বৃদ্ধের সাক্ষ্য এই—'ধ্যান বিষয়ে যখন বিশেষ কিছুই জানিতাম না, তখনকার একটী ঘটনার কথা বলি। বলিতে স্বভাবতঃই সঙ্কোচ হয়, কিন্তু "Where sin abounded, grace did much more abound" (Romans, 5. 20), স্বীয় জীবনে St. Paul এর এই উক্তির

সাক্ষাৎ প্রমাণ পাইয়া সেই সঙ্কোচ পরিহার করিলাম। মানুষ যত বড় পাপী হউক না কেন, ভগবৎ-কৃপা কখনো তাহাকে পরিত্যাগ করে না। পাপের সীমা আছে, কিন্তু তাঁহার করুণার অবধি নাই। পাপীরও আশা আছে, সেও ব্রহ্মানন্দের আস্বাদন হইতে একেবারে বঞ্চিত নয়, ভগবৎকরুণা তাকেও বরণ করে, ইহার সাক্ষ্য দেওয়ার জন্যই জীবনের এই বিশেষ স্মরণীয় দিনের কথা বলিতেছি। বহুবৎসর পূর্ব্বে আমি একবার ঢাকা নগরীতে নববিধান সমাজের মাঘোৎসবে যোগদান করি। উৎসবের একদিন রমনার মাঠে নবাব সাহেবের উদ্যানের নিভৃতে নীরব উপাসনা ও ধ্যানের জন্য নির্দ্দিষ্ট ছিল। ভক্তজনদের সহিত আমি ও তাহাতে যোগদান করিলাম। সেই সময়ে আমার জীবন পরীক্ষা ও সংগ্রামের ভিতর দিয়া অতিবাহিত হইতেছিল। 'Man's extremity, God's opportunity,'—মানুষের সঙ্কট, ভগবানের সুযোগ,—বুঝি এইজন্যই সেই সময়ে আমার উপরে বিধাতার অনির্ব্বচনীয় করুণা অবতীর্ণ হইয়াছিল। ভক্তিভাজন উপাচার্য্য ৺বঙ্গচন্দ্র রায় মহাশয় একটী মধুর প্রার্থনা করিলেন, সেই প্রার্থনা অভূতপূর্ব্বভাবে প্রাণকে স্পর্শ করিল। সেই প্রার্থনার মধ্য দিয়া জীবনপতি আমার চিত্তকে প্রস্তুত করিলেন। উপাচার্য্য মহাশয়ের নির্দ্দেশে আমরা প্রত্যেকে নীরব উপাসনা ও ধ্যানের জন্য এক একটী স্বতন্ত্র ঝোপের নিরালায় যাইয়া বসিলাম। বেলা তখন প্রায় দেড়টা।

উপাচার্য্য মহাশয়ের প্রার্থনার ভাবটী আমার মনকে অধিকার করিয়াছিল, সেই ভাবের অনুসরণ করিয়া আমার অজ্ঞাতসারে আমার রিক্ত আত্মা ক্রমে ধ্যানের রাজ্যে শান্তি ও আনন্দের ক্রোড়ে প্রবেশ করিল। সে এক অপূর্ব্ব অবস্থা। কোথায় বিক্ষেপ, কোথায় দুঃখ, কোথায় পরীক্ষা, কোথায় সংগ্রাম! সে অবস্থার সম্ভোগ "মূকাস্বাদনবৎ" (নারদ-ভক্তিসূত্র, ৫৩)—মূক ব্যক্তির আস্বাদনের ন্যায়—অনির্ব্বাচ্য,—ভাবের প্লাবনে ভাষার নির্ব্বাণ। মূর্চ্ছিত নই, নিদ্রিত নই, জাগ্রত, উপবিষ্ট, বাহিরের কোন ধ্বনি কানে পৌঁছে না, সমস্ত নিঝুম।

গোধূলি উত্তীর্ণপ্রায়, প্রকৃতির দেহে রজনীর অন্ধকারের ছায়া পড়িয়াছে, গৃহে যাইবার জন্য অনেকে আমার অপেক্ষা করিতেছেন, ডাকিবেন কিনা ইতস্ততঃ করিতেছেন। অবশেষে আমাকে ডাকা হইল, অনেক ডাক নাকি শুনি নাই। যখন শুনিলাম একজন বন্ধু আমাকে নাম ধরিয়া ডাকিয়া বলিলেন, 'প্রায় ৪ ঘণ্টা হয়ে গেল, এখন যে ৫॥টা বাজে, আপনি কি উঠবেন না? বাড়ী যাবেন না? অন্ধকার হয়ে গেল যে, এখন উঠুন।' চক্ষু চাহিয়া দেখিলাম আরেক রাজ্য, প্রথমে বুঝিতে পারিলাম না কোথায় আছি, তখনই মনে পড়িল আমরা ত রমনার উদ্যানে ধ্যানে বসিয়াছিলাম, বলিলাম 'চলুন যাই'। আর অন্তর হইতে এই কথাই নীরবে উত্থিত হইতে লাগিল, 'ধন্য দয়াল, ধন্য তোমার প্রেম, ধন্য তোমার করুণা।'

জীবনের সেই শুভ লগ্ন, সেই দীক্ষা-লগ্ন কখনো ভুলিবার নয়, ধ্যান যোগে সেই লগ্নের সাক্ষাৎকার হইয়াছিল, সেই সাক্ষাৎকার চিরদিনের মত এই অকৃতী অধমের আত্মাকে প্রলুব্ধ করিয়া, তৃষিত করিয়া রাখিয়াছে।'

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ম্, সত্যমেব জয়তে,
ব্রহ্মকৃপাহি কেবলম্।
ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ হরিঃ ওঁ।

---

৪৯ পৃষ্ঠার প্রথম তিন ছত্রের পর পঠিতব্য :—

"বলিয়া দাও, আজিকার এ সভাতে দীপ আনিও না, কারণ আমাদের আজিকার সভাতে সখার মুখই পূর্ণচন্দ্ররূপে উদয় হইয়াছে।"

(হাফেজের গান)